প্রবহমান বাংলাচর্চা

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

১

সম্পাদক

সনৎকুমার নস্কর

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

রেজাউল করিম • দীপঙ্কর মল্লিক

প্রবহমান বাংলাচর্চা

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

বাংলাচর্চার দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নিবন্ধাবলি

সম্পাদক

সনৎকুমার নস্কর

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

রেজাউল করিম
দীপঙ্কর মল্লিক

সম্পাদনা সহযোগী

অধ্যাপিকা সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	অধ্যাপক তপন মণ্ডল
অধ্যাপক স্বপন কুমার আশ	প্রণব নস্কর
দেবারতি মল্লিক	তাপস পাল
ত্রয়ী চ্যাটার্জী	বাপ্পা প্রামাণিক
তুষার রায়	জাহির সর্দার
মধুসূদন সাহা	আশিস রায়
শ্রীকান্ত নাথ	সমীরণ চক্রবর্তী

প্রবহমান বাংলাচর্চা

বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪

PROBAHAMAN BANGLACHARCHA

Edited by *Sanat Kumar Naskar*

A collection of selected research articles presented in the Second International *Bangal Charcha* Seminar

Published on 23rd Janurary 2017

© BANGLA CHARCHA

Rs. 600/-

Published by *Debarati Mallik*
Diya Publication, 44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 9836733393/9836733383/033-64523777
Website : diyapublication.com
e-mail : diyapublication@gmail.com

ISBN : 978-93-82094-05-0

প্রবহমান বাংলাচর্চা

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন
বাংলাচর্চার দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নিবন্ধাবলি

প্রথম প্রকাশ : ২৩ জানুয়ারি ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : প্রবহমান বাংলাচর্চা

মূল্য : ৬০০

সূ।চি।প।ত্র

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য

প্রসঙ্গ : মঙ্গলকাব্যে হিন্দু বাঙালি বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান ১৫
শান্তনু ভট্টাচার্য

বিস্মৃতির আড়ালে বৈষ্ণব শ্রীপাট কুলিয়া ২৩
মিতালি বিশ্বাস

বৈষ্ণবীয় ভাবধারা ও ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্য ২৮
নব্যেন্দু রায় চৌধুরী

গোবিন্দদাসের বিদ্যাপতি অনুসরণ কয়েকটি প্রশ্ন ও প্রেক্ষাপট ৩৪
দীপায়ন প্রামাণিক

বাঙালি মুসলমানের সংকট : প্রাগাধুনিক যুগ ৪১
তুহিনা বেগম

মঙ্গলকাব্যের ধারায় লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ৫০
রূপা ঘোষ

বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট : চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্ম ৫৫
চৈতালী ঘটক (রায়)

কাব্য-কবিতা

দেবারতি মিত্রের কবিতা : সময়ের জলছবি ৫৯
সত্য দাস

বিনয়ের নির্মীয়মান-পর্বের কবিতার চিত্রকল্পনাগুলি ৬৬
স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় শিব ৭৭
কানাইদাস মণ্ডল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : কবিতা, প্রেম ও নারী ৮৭
রিয়া ঢোল

হেমচন্দ্রের গীতিকবিতা : স্মৃতি ও বিস্মৃতি ৯৩
নকুলচন্দ্র বাইন

বাংলার মুখ : জীবনানন্দ দাশ ১০০
সম্রাট দত্ত
সমর সেনের কবিতায় অন্ধকারের ব্যবহার ১০৭
অনুপম প্রামাণিক
নকশালী সত্তর : কবিতার কার্তুজ ১১২
সৌমী বসু
'অসংলগ্ন অন্তরাল'-এর কবি সুনন্দা মৈত্র ১২৫
স্বরাজ কুমার দাশ
বাংলা গীতিকবিতার ধারায় মহিলা কবি কামিনী রায়ের
কবিতায় গীতিকাব্যিক মূর্ছনা ১৩৪
মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ
নির্মল হালদারের কবিতা : অনন্য ভুবনের পরিক্রমা ১৪০
তুষার কান্তি হালদার
কবিতার আলোকে মন্দাক্রান্তা সেন ১৪৪
চৈতালী দাস
বিষয় বৈচিত্র্যে শেকসপিয়রের সনেট ১৪৮
ঋতুপর্ণা বসাক

নাটক

আঞ্চলিক ভাষাচর্চার উজ্জ্বল দিশা দীনেশচন্দ্র রায়ের 'নরলোকের চিত্' ১৫১
সুধাংশুকুমার সরকার
উৎপল দত্তের একাঙ্কিকা 'ঘুম নেই' : একটি নিবিড় পাঠ ১৫৬
চন্দন কুমার সাউ
মহাভারতের বিনির্মাণ : 'শর্মিষ্ঠা' ১৬৫
গৌতম চন্দ্র বাঁড়ে
ডাক—ঘর থেকে পথে ১৭৮
শোভনা ঘোষ
বিসর্জন : বর্তমান বিশ্ব অস্থিরতার মূল শিকড়ের অনুসন্ধান ১৮৬
সুফল বিশ্বাস

উনিশ শতকের সমাজ-আন্দোলনে 'রামমোহন' ও 'বিদ্যাসাগর' :
জীবনী নাটকের দর্পণে ১৯৪
স্বপন কুমার আশ

বিজয় তেন্ডুলকরের নাটক : বিতর্ক থেকে বিতর্কে ২০৬
অমল মোদক

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রবীন্দ্রবিদায় : একটি সাহিত্যিক সম্পর্কের খতিয়ান ২১৭
শ্রীতম মজুমদার

সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' : উদ্বাস্তু জীবনের বিপন্ন চিত্র ২২৭
মনিহার খাতুন

আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতার প্রতীক : 'প্রথম পার্থ'-র কর্ণ ২৩৩
শম্পা সিন্‌হা বসু

উপন্যাস

লোকজীবন অনুসন্ধান : মহাশ্বেতা দেবীর একটি উপন্যাস ২৩৯
তপন বর

সুমিত্রা দেবীর মুখোশের আড়ালে বৈঠকি মেজাজে মহাশ্বেতা দেবী ২৪৯
বসুন্ধরা মণ্ডল

অন্তর্জলী যাত্রা : উপন্যাস-চলচ্চিত্রে নির্মাণ এবং বিনির্মাণ ২৫৫
বিভাষ নায়েক

প্রতিবাদের আর এক নাম মহাশ্বেতা ২৬৩
রানু কর্মকার

আঞ্চলিকতার প্রেক্ষাপটে 'লালমাটি' ২৭১
শকুন্তলা দাস

বাংলা সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও রমাপদ চৌধুরীর তুলনা ২৭৯
রানু বিশ্বাস

একালের নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান ২৮৬
দীপঙ্কর দে

'তিতাস একটি নদীর নাম' লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি ২৯০
শিখা ঘোষ

খল চরিত্র প্রসঙ্গে 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর রুক্মিণী ২৯৮
প্লাবন সিংহ
একটি ভাবনার মুকুরে প্রতিবিম্বিত দুই নির্মাণ :
'অলীক মানুষ' ও নিঃসঙ্গতার একশ বছর ৩০৩
বাণী দাস
সময়ের স্বর ও সমাধানে দীনেশচন্দ্র সেনের 'চাকুরীর বিড়ম্বনা' ৩০৭
মিঠুন দত্ত
বৃহন্নলা : মনের ছদ্মরূপ ৩১৬
বর্ণালী প্রামাণিক
মাতৃত্বের অন্বেষণে অনুরূপা দেবীর 'মা' ৩২৩
মৌসুমী সিংহ
ক্ষমতা ও আধিপত্য তত্ত্বের প্রেক্ষিতে 'অরণ্যের অধিকার' ৩৩০
তাপস পাল
বঙ্কিম-সাহিত্যে ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি ৩৩৫
তমালী মুস্তাফী
মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে অন্ত্যজবর্গের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ৩৪০
মহ. আসফাক আলম
বাংলা সাহিত্যে বৃত্তি ও তারাশঙ্কর ৩৪৬
সুমন দাস
'জনপদ' : নবমূল্যায়নের প্রেক্ষিতে ৩৫৮
মৌমিতা তালুকদার

ছোটোগল্প

রবীন্দ্র ছোটোগল্পে মুসলিম প্রেমিকা ও বীরাঙ্গনা নারী ৩৬৪
পার্থপ্রতিম হালদার
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটোগল্পের নির্মাণ-শিল্প ৩৭০
অরিত্র বাগ
বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় ব্যতিক্রমী গল্পকার জগদীশ গুপ্ত ৩৭৯
দুরন্ত মণ্ডল
মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক ভাবনা : ইলিয়াসের ছোটোগল্প ৩৮৫
জয় দাস

সুবোধ ঘোষের 'বারবধূ' : পুরুষতান্ত্রিক
সমাজ-মানসের অন্তর্লীন প্রতিচ্ছবি ৩৯১
দীপায়ন পাল
তেভাগার গল্পের প্রতিবাদী মানুষ : না জানা ইতিহাসের
অধ্যায় থেকে যাত্রা ৩৯৫
মৈত্রেয়ী সরকার
ষাট-সত্তরের ছাত্র আন্দোলন ও বাংলা ছোটগল্প ৪০০
মাণিকলাল সাহা
অসীম রায়ের ছোটোগল্প : বিপ্লবী চিন্তা-চেতনার অনুসন্ধান ৪০৫
মোনাব মণ্ডল
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্প : রাঢ় বাংলার প্রকৃতি ও মানুষ ৪১১
আলিপনুর আহমেদ
ভগীরথ মিশ্রের ছোটোগল্পে ব্রাত্যজীবন ৪১৯
ঝিনুক ব্যানার্জী
রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের দুই বিচিত্র বালক ৪২৩
শ্রুতিপর্ণা রায়
পরিবহণকর্মী এবং বাংলা গল্প : সমাজ-মনের বীক্ষণে ৪২৮
শুভঙ্কর রায়
কোজাগরীর মিথ ভেঙে 'বন্দিনী কমলা' ৪৩৫
মৈত্রী দাস
দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে দেহদান ৪৪০
সফিকুল হাসান মল্লিক

লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি

ট্যাবু : সমাজবৈজ্ঞানিকতা ৪৪৯
স্বপন বিশ্বাস
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রূপকথার প্রাসঙ্গিকতা ৪৫৪
ত্রয়ী চ্যাটার্জী
লোকসংস্কৃতির আলোকে বাংলার ছেলেভুলানো ছড়া ও রবীন্দ্রনাথ ৪৬৪
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা : প্রসঙ্গ লোকশিল্প ৪৭৩
উত্তমকুমার মণ্ডল
ডাকনাম ৪৮২
ত্রিসপ্ত প্রদীপ
উপন্যাসে মন্ত্রাচার : প্রবহমান সাহিত্যের ভিন্ন স্বর ৪৮৮
শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম
রূপবতী ৫০৩
বিলাশ মাল
ধাঁধায় বিজ্ঞান চর্চা ৫০৮
সুবর্ণা সিকদার

বিবিধ

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার পাঠ ও মানকুমারী বসু ৫১৫
পীযূষ নন্দী
বাংলা সাহিত্যে রোগ ও চিকিৎসা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও
বিংশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা ৫২৩
মহ. জাহান আলি পুরকাইত
উনিশ শতকের আলোয় নারীর ভুবন ৫৩১
মৌসুমী পাত্র
To the Silence and the Sounds :
ভ্রমণকথায় আত্মনির্মাণ এবং বাঙালি নারী ৫৩৭
সুলগ্না খান
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কল্পবিজ্ঞান
সাহিত্যের রূপরেখার ইতিকথা ৫৪৪
চিরশ্মিত ঘোষ
ব্যতিক্রমী আত্মজীবনী : তসলিমা নাসরিনের
'আমার মেয়েবেলা' ও 'উতল হাওয়া' ৫৫৮
অর্ণব বল
মেয়েদের কলমে : মেয়েদের পরিচয়-অপরিচয় ৫৬৪
মোনালিসা ঘোষ

কালিদাসের শকুন্তলা : রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ৫৬৯
দীপক নন্দী
'বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচার'-এর
প্রতিষ্ঠা ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' রূপান্তর ৫৭৩
শুভাশিষ গায়েন
'ছিন্নপত্র' : ফিরে দেখা ৫৮০
সঞ্চিতা হাজরা
কিশোর সাহিত্যিক স্বপনবুড়ো ৫৮৬
সারদা মাহাতো
বিনোদিনী দাসীর আত্মকথা : বাংলার সমাজপটে ৫৯৪
দিলীপ হাজরা
গঠনশৈলীর আলোকে নীলু হাজরার হত্যারহস্য ৬০৪
অনিকেত মহাপাত্র
স্বাতন্ত্র্যময়ী নারী ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ৬১২
জয়শ্রী রায়
সময়ের তালে তালে বাঙালির সংস্কৃতি ৬২০
ওয়াহিদুজ্জামান রনি
অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাহিত্যচিন্তা ৬২৬
উর্বী মুখোপাধ্যায়
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যচিন্তা ৬৩২
অনুনয় চট্টোপাধ্যায়
শওকত আলী : বাংলা কথাসাহিত্যে একটি ব্রেক্ত হীন স্বর ৬৩৭
আবিদ হাসান
ব্যোমকেশ কাহিনির দেশ-কাল-পটভূমি ৬৪৫
দেবজ্যোতি মণ্ডল
বাঙালির শাস্ত্রীয়-সংগীতচর্চায় সংগীতশাস্ত্রী
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর পরোক্ষ অবদান ৬৫৬
নীলাংশু অধিকারী
বাংলা সাহিত্যে সাগর দিঘি ৬৬৩
দেবায়ন চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে সাহিত্য ও
সমালোচনা তত্ত্ব : একটি অন্বেষণ ৬৭০
শিমূলচন্দ্র সরকার
মহাকবি কালিদাস এবং বিষয় বৈচিত্র্যে তাঁর মহাকাব্যরস ৬৭৭
রুম্পা দাস
কমলাকান্ত চক্রবর্তী ও দুঃখহরণ কেওড়া :
দুই শতাব্দীর মুখোমুখি দুই কালপুরুষ ৬৮১
দিব্যেন্দু পালধি
বাঙালি সমাজ সংস্কৃতির সংগঠনে মোহাম্মদী পত্রিকার ভূমিকা ৬৮৭
সৌমিতা দাস
শাহাদাৎ হোসেন ॥ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক বিস্তৃত অধ্যায় ৬৯০
হাবিবা রহমান
সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ ॥ জীবনবীক্ষার সূত্র সন্ধান ৬৯২
সেলিনা ইয়াসমিন
দক্ষিণবঙ্গের কৃষকসমাজের ভাষা ॥ এক সমাজভাষাতাত্ত্বিক বীক্ষা ৬৯৪
এ টি এম সাহাদাতুল্লা
উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবাদের পদধ্বনি ৬৯৮
জিয়াউল হক
ঠাকুরবাড়ির স্মৃতিকথায় নারী মন ও মনন ৭০১
মধুসূদন সাহা

দক্ষিণবঙ্গের কৃষকসমাজের ভাষা : এক সমাজভাষাতাত্ত্বিক বীক্ষা

এ টি এম সাহাদাতুল্লা

সামাজিক মানুষ তাঁর মানসিক চাহিদা পূরণের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে ভাষা তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো জৈবিক চাহিদা পূরণ করার জন্য আমরা যেমন বিশেষ কিছু ক্রিয়া করি তেমনি মানসিক চাহিদা পূরণের জন্যও আমাদের মধ্যে নানা ক্রিয়াশীলতা লক্ষ করা যায়। এই ক্রিয়াশীলতার ঘাত-প্রতিঘাতে প্রস্তুত হয় ভাষার পটভূমি। ভাষার রয়েছে হাজারও রূপ। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে যেমন ভাষাভেদ হয় তেমনি বিভিন্ন সামাজিক অনুষঙ্গের সাপেক্ষে কোনো ভাষাসম্প্রদায়ের মধ্যে কতশত বৈচিত্র্য দানা বাধে। কৃষক সম্প্রদায়ের ভাষা এইসব বিচিত্র রূপের একটি। কৃষিকাজ মানবসভ্যতার ধারায় অদ্যবধি সর্বাধিক চর্চিত এক বৃত্তি। সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে কৃষিকাজের বিষয়টি। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে কৃষিক্ষেত্রে যেমন বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছে, তেমনি কৃষক সমাজের ভাষারূপেও লক্ষ করা গেছে নানা রঙ। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের কৃষকদের ভাষা অন্য অঞ্চলের তুলনায় কমবেশি বিভিন্ন। দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজের ভাষারীতি যেমন। এখানকার কৃষকদের ভাষায় রয়েছে একটা নিজস্বতার দিক। একদিকে চাষ-আবাদের স্থানীয় শ্রেণিচরিত্র অন্যদিকে এতদঅঞ্চলের আঞ্চলিক ও সামাজিক উপভাষার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সবমিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজের ভাষারীতিতে যে নিজস্বতা তৈরি হয়েছে তা আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে। অপরাপর অঞ্চলের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গের ভাষারীতির যেমন একটা নিজস্বতার দিক রয়েছে তেমনি সময়ের পরিবর্তনে সেটির নিজস্বতায় মাত্রাগত বিভিন্নতা লক্ষ করা গেছে। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই আঞ্চলিক নিজস্বতার বিষয়ে আসা যেতে পারে।

১) দুশো করে হাজার লেলো, তাও বুঝতুম যদি জাতে ভালো হতো।

এক হাজার ফুলকপির চারা দুইশত টাকা দিয়ে ক্রয় করতে হয়েছিল। দরটা একটু বেশিই ছিল। এতে আপত্তি করেননি ভদ্রলোক। ভালো ফলন হলে চারার দামের একটু কম-বেশিতে কিছু এসে যাবে না। কিন্তু সমস্যা হয়েছে গোড়াতেই। চারার জাত ভালো হয়নি। ফল ছোটো, আর রঙেও তেমন উজ্জ্বল নয়। লাভালাভের প্রশ্নে একজন কৃষক ততটা ভাবিত হন না,তার থেকে অনেক বেশি প্রাণিত হন সৃষ্টির আনন্দে। এক্ষেত্রে সেই আনন্দেরই হানি হয়েছে। জাত ভালো না হওয়ায় ফলন ভাল হয়নি। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর হয়েছেন ভদ্রলোক। সে যন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছে তার নিজস্ব ভাষায়। নিয়েছিল ধ্বনি পরিবর্তনের ধারায় হয়েছে লেলো। ক্রিয়াপদের এমন সংক্ষিপ্ত রূপ দক্ষিণবঙ্গের সমাজ ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তাও বুঝতুম কৃষকদের

নিজস্ব বাক্‌রীতি। শব্দ এখানে আভিধানিকতার সীমা অতিক্রম করেছে। বুঝতে পারতাম শব্দবন্ধ বিশেষ রূপে বিশেষ ভাবকে বহন করে। বুঝতুম এখানে মনকে প্রবোধ দিতাম, মেনে নিতাম ইত্যাদি ভাবের দ্যোতক।

২) গোড়ালে পাঁচ আর আগালে তিন টাকা করে দিতি হবে।

গোড়ালে, আগালে এসব একান্ত কৃষিজ সংস্কৃতি-জাত শব্দ। শব্দদুটি এক্ষেত্রে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পাট গাছ থেকে যে পাটকাঠি হয় তার রকমফের হল গোড়ালে আর আগালে। পাটকাঠি থেকে পাটের আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়ার সময় কখনো কখনো পাটকাঠিটিকে মাঝখান থেকে ভেঙে ফেলা হয়। খণ্ডিত পাটকাঠির গোড়ার দিকের অংশ হল গোড়ালে, ডগার দিকের অংশ আগালে। গোড়ালে অংশ পুরু ও শক্ত। এর জ্বালানি মূল্য বেশি, তাই দাম বেশি। পাটকাঠি সাধারণত বোঝা বেঁধে বিক্রি করা হয়।

৩) বেশি বেশি দেড় হাতি ছটা দিই তাও নাকি ওগা পোষায় না। যাগগে যা যেখানে পোষায় যাগগে যা।

পাটকাঠি, গমকাঠি, সরিষা গাছ প্রভৃতি জিনিস বোঝা বেঁধে বিক্রি করার ক্ষেত্রে পরিমাপক একক হিসাবে ছটার প্রচলন রয়েছে দক্ষিণ বঙ্গের কৃষক সমাজে। পাটের দড়ি, কলার বাসনা ইত্যাদি দিয়ে ছটা তৈরি করা হয়। ছটার দৈর্ঘ্য অনুসারে বোঝার পরিমাপ বিভিন্ন হয়। ছটাগুলি সাধারণভাবে এক, দেড়, দুই, আড়াই, তিন হাতের হয়। দেড় হাতের সামান্য বেশি দৈর্ঘ্যের ছটাকে বেশি বেশি দেড়হাতি বলা হয়েছে। শুধু শব্দ ব্যবহারে নয়, কৃষকদের ভাষা হিসাবে এখানে বাক্‌ভঙ্গিগত একটা নিজস্বতাও রয়েছে। যাগগে যা যেখানে পোষায় যাগগে যা— ভাষা দৃঢ়পিনদ্ধ নয়, একটু আলুলায়িত ভাব আছে। এই আলুলায়িত ভাবকে ধারণ ও বহন করার জন্য যাগগে যা শব্দবন্ধকে দ্বিতীয় বারেও পূর্ণরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা এক্ষেত্রে সাধারণভাবে বলি — যেখানে পোষায় সেখানে যাক ইত্যাদি।

৪) মাতানে ভিতরে কিছু নেই, সব এক সার। আমার কাছে ওসব হয় না।

উৎপন্ন ফসল বিক্রি করার ক্ষেত্রে কৃষকদের ব্যবহৃত নিজস্ব পরিভাষা। পটল, বেগুন প্রভৃতির বাজার সাজানোর সময় অনেকক্ষেত্রে ভালো ভালো জিনিসগুলিকে উপরের দিকে রেখে অপেক্ষাকৃত খারাপ জিনিস ভিতরের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য পাইকারকে ঠকানো। উপরের দিকে রাখা এই সেরা জিনিসগুলি হল মাতানে। এক্ষেত্রে জনৈক কৃষক পাইকারকে বোঝানোর চেষ্টা করছে তার বাজরায় আলাদা করে মাতানে রাখা হয়নি। উপরে নিম্নে সর্বত্র মালের ধরন এক। ভদ্রলোক মাতানে দিয়ে পাইকার ঠকানোকে অনৈতিক কাজ বলে মনে করেন। তিনি কখনো এই অনৈতিক কাজ করেন না বলে দাবি করেছেন। তবে তার এই দাবির যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কেননা অধিকাংশ কৃষকই এমন দাবি করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিপরীত ঘটনা।

৫) যে এল চষে সে রইবে বসে নাড়া কাটারে ভাত দিতি হবে পাথর ঠেসে; এসব আমার দে হবে না।

কৃষি-কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে জমিতে লাঙল দেওয়া প্রথম ও প্রধান করণীয়। এই কাজের মূল্য তাই আলাদা। যে লাঙল চালায় বা তদনুরূপ পরিশ্রমসাধ্য কাজ করে, পরিবারে তার একটা সম্ভ্রমের স্থান থাকে। এখানে সেই সম্ভ্রমের সুরই উচ্চারিত হয়েছে। পরিবারের দুই ছেলের একজন তেমন কাজের নয়। গৃহকর্ত্রী তাকে নেক নজরে দেখতে চান না। হাল চালান যেটা তার মূল্য অনেক বেশি। তাকেই তিনি প্রথমে থালা ভরে ভাত দিতে চান। অবশিষ্ট থাকলে নাড়া কাটারে দেবেন। এমনিতে বিষয়টি কৃষি- সংস্কৃতি নিরপেক্ষ যেকোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে কৃষি-সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে তা এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। অকর্মণ্য অর্থে বলা হয়েছে নাড়া কাটা। ধান গাছ কেটে নেওয়ার পর যে অংশটুকু থেকে যায় তাকে নাড়া বলা হয়। নাড়ার অর্থমূল্য যৎসামান্য। গ্রামের হতদরিদ্র লোকেরা এইসব নাড়া কেটে নিয়ে যায়, জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে। সম্পন্ন কৃষকের ঘরে এর কোনোই মূল্য নেই। অকর্মণ্য, এই বিশেষ আভিধানিক শব্দটির উপর আধিপত্য স্থাপন করতে না পেরে জনৈক কৃষক-বধূ তার নিজস্ব সংস্কৃতির অনুষঙ্গে নাড়া কাটা শব্দবন্ধকে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে।

এমন মনে করলে ভুল হবে যে, দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজে প্রচলিত এই ভাষারীতি অপারপর অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমাজ ভাষায় এটা কখনো হয়। পাশাপাশি দুটি অঞ্চলের একই সমাজভাষিক সম্প্রদায়ের ভাষারীতির মধ্যে কখনো অচল ব্যবধান তৈরি হয়না। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এখানকার ভাষারীতিতে উত্তরবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের তুলনায় শব্দ ব্যবহারে, বাচনভঙ্গিতে কমবেশি বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। এই বৈচিত্র্যতেই এর নিজস্বতা।

একটা সময় পর্যন্ত আমাদের দেশের কৃষকরা শুধুই খেয়ে পরে বেঁচেবর্তে থাকার তাগিদে কৃষিকাজ করতেন। তখন সাংসারিক প্রয়োজন অনুসারে ধান, গম, মটর, মুসুরি, আলু, পটল প্রভৃতির চাষ করা হতো। বিক্রিবাটার বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ক্রমে ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হল। বাজার অর্থনীতি ছায়াপাত করল কৃষক পরিবারের গণ্ডীতে। কৃষিক্ষেত্রেও পড়ল তার অনিবার্য প্রভাব। নজর দেওয়া হল নগদ মুনাফার দিকে। যে অঞ্চলে যে ফসল ফলানো অধিক লাভজনক তারই চাষ চলতে থাকে। বিশেষ করে। এতে কোনো অঞ্চলে অপ্রচলিত হয়ে পড়ল এক একটি কৃষিজ ফসল, সেইসঙ্গে তৎসংশ্লিষ্ট সব ভাষা। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আখ চাষের যথেষ্ট চল ছিল। এখন তা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। ভাষা-সংস্কৃতিতে লক্ষ করা গেছে তার প্রভাব। হারিয়ে যেতে বসেছে বহুবিধ বাকরীতি-ধানগাছ ওঠা, বানতোলা প্রভৃতি। সময়ের অভিঘাতে কোনো অঞ্চলে যেমন বিশেষ কোনো ফসল অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে অন্যদিকে তেমনি নতুন নতুন সব চাষের প্রচলন হয়েছে। ওইসব চাষবাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে গড়ে নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু শব্দ-কথা। কখনো বা পুরনো কোনো শব্দকে নতুন করে প্রাণ দেওয়া হয়েছে।

গোড়া, পোন প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার একটা সময় দক্ষিণবঙ্গে প্রায় সর্বত্র কৃষক সমাজে খুবই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। এখন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কলাচাষ, পানচাষ প্রভৃতি প্রবর্তিত হওয়ায় শব্দগুলি আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পটলের ফুল ঠেকানো, লাউ-এর মাচা দেওয়া

এসব কথার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না আমাদের ঠাকুর্দারা। তাঁরা প্রকৃতির উপর বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। মৌমাছিসহ অনুরূপ কীট-পতঙ্গের দ্বারা পরাগ মিলন ঘটতো এবং কমবেশি ফসল ফলতো। এখন পুং লিঙ্গ ফুলগুলিকে সংগ্রহ করে তা দিয়ে বিশেষ উপায়ে পরাগ মিলন ঘটানো হচ্ছে। বিষয়টিকে বলা হয়েছে ফুল ঠেকানো। রসায়নিক সার প্রচলিত হওয়ার আগে জৈব সারের উপর নির্ভর করতেন কৃষকরা। জৈব সারকে তারা বলতেন গুবরে সার। গুবরে সার সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হত 'সারগাদা'। রাসায়নিক সারের দাপটে গুবরে সার এখন অপ্রচলিত প্রায়, নষ্ট হয়েছে সারগাদার ঐতিহ্য।

'জোনের পান্তা' কথাটি এই সেদিন পর্যন্ত প্রতিটি সম্পন্ন কৃষক পরিবারে বহুল চর্চিত ছিল। এখন তাতে ভাটার টান শুরু হয়েছে। আগে যারা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে, বিশেষ অর্থে জোন খাটতে আসতো তাদের পক্ষে পেট ভরে একবেলা খেতে পাওয়াটাই ছিল বিরাট বিষয়। খাওয়ার কমতি হলে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কৃষকের খুব দুর্নাম হতো। তারা তাই অত্যন্ত সচেতন থাকতেন। বাড়ির মেয়েরা আগের দিন রাত্রে উপযুক্ত পরিমাণে ভাত রেঁধে রাখতেন। সকাল সকাল তা মাঠে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এখন জোনেদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাদের হাঁড়িতেও সকালে খেয়ে বেরনোর মতো ভাত অবশিষ্ট থাকে। তারা কাজের বিনিময়ে খাওয়ার প্রত্যাশা করে না, পরিবর্তে নগদ পয়সা চায়, ওদের কথায় 'জোনের দাম'। জোনের দামের সঙ্গে কৃষি শ্রমিকরা এখন খাওয়া বাবদ নগদ পয়সা দাবি করে। নগদ পয়সা নেওয়ার প্রবণতা যত বৃদ্ধি পাবে জোনের পান্তা-র ব্যবহার তত হ্রাস পাবে।

'মেন্দার' কথাটি এখন দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজে কোথাও কোথাও অপ্রচলিত হয়ে পড়ছে। বছর কুড়ি আগেও কথাটি বিভিন্ন জায়গায় শুনতে পাওয়া যেত। তখন গ্রামের হতদরিদ্র মানুষের পক্ষে জমিতে কাজ করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত লোক সবসময় পাওয়া যেত। কাজের লোকেদের সারা বছর কাজ জুটত না, ওদের পরিভাষায় জোন বইত না। জোন না বইলে উনানে হাঁড়ি চড়ে না। এই অবস্থায় সারা বছর নিশ্চিত কাজ পাওয়ার লক্ষ্যে কৃষি-শ্রমিকরা অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে কোনো সম্পন্ন কৃষকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতো। চুক্তিবদ্ধ ওই শ্রমিককেই বলা হতো 'মেন্দার'। এখন অনেক বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে এখন আর শ্রমিক উদ্বৃত্ত নয়। কোনো শ্রমিককে তাই আর 'মেন্দার' হতে হচ্ছে না।

দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজে প্রচলিত এই যে ভাষা-সংস্কৃতি তা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কৃষিকেন্দ্রিক ভাষা-সংস্কৃতি ধারণ করে সমাজেতিহাসের বহুবিধ মূল্যবান উপাদানকে। ইতিহাস চর্চার প্রচলিত পথে সমাজেতিহাসের যেসব দিক অধরা থেকে যায় কৃষিকেন্দ্রিক ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার সূত্রে পৌঁছে যাওয়া যায় সেসব অধরা বিষয়ের গভীরে। তাই এক্ষেত্রে গবেষণা হওয়া জরুরি।

বাংলা সাহিত্যের ভাষা

কালে-কালান্তরে

সম্পাদনা

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

দীপঙ্কর মল্লিক

বাংলা সাহিত্যের ভাষা

কালে-কালান্তরে

সম্পাদনা

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

অধ্যাপক দীপঙ্কর মল্লিক

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

প্রকাশনা

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

বেলুড় মঠ, হাওড়া

পরিবেশনা

দিয়া পাবলিকেশন

৪৪/১এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

Bangla Sahityer Bhasha : Kale-Kalantare

Published by *Swami Shastrajnananda*
Principal, Ramakrishna Mission Vidyamandira
Belur Math, Howrah, West Bengal
Phone : 033-2654-9181/9632

Collaboration with

Diya Publication
44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 9836733383/9836733393
e-mail : diyapublication@gmail.com
website : www.diyapublication.com

ISBN : 978-93-82094-36-4

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ২০১৯

বিনিময় : ১৫০

বিষয়সূচি

বিংশ শতাব্দীর তিন কিশোর চরিত্র ও তাদের ভাষা-ভাবনা/৭
অরিত্রী দে

উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের সূচনা/১৩
শাশ্বতী মণ্ডল

মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর কবিদের কাব্যভাষার অবদান/১৯
রানা রায়

বাংলা সাহিত্যের ভাষা : কালে কালান্তরে/২৬
রাতুল দাস

বাংলা সাহিত্যের ভাষা বিবর্তনে গণনাট্য-নবনাট্যের অবস্থান/৩৬
এ. টি. এম. সাহাদাতুল্লা

পূর্ববঙ্গীয় নারী কথাসাহিত্যিকদের ভাষারূপ ও ভাষাবিবর্তন/৪৭
রেজমান মল্লিক

'তিতাস' ও 'গঙ্গা'র ভাষা/৫৮
সুশান্ত মণ্ডল

চণ্ডীমঙ্গল : ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণে নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ/৬৮
বিলাশ মাল

উনিশ শতকের গদ্য ভাষায় শৈলীগত বিবর্তন/৮১
(ফোর্ট উইলিয়ম থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত)
পৃথা সরকার

বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষা/৯৮
বীরেন হালদার

বাংলা গদ্যভাষার তত্ত্বগত ভাবনায় উনিশ শতকের প্রধান তিন প্রাবন্ধিক :
রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ/১১৯
অভিজিৎ মাইতি

দোভাষী পুথি সাহিত্যের ভাষা ও গরীবুল্লাহর 'জঙ্গনামা' : একটি সমীক্ষা/১২০
ফাহাদ আলম

হলদে পাখির পালক : কৈশোর চেতনার স্বরলিপি/১২৯
শর্মিষ্ঠা ধারা

দলিত সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য-স্বরূপ/১৩৭
সনৎকুমার নস্কর

অক্ষয়কুমার দত্তের গদ্যভাষা : একটি সমীক্ষা/১৫৭
কৌশিক কর্মকার

'যে আঁধার আলোর অধিক' : একটি কাব্যতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ভাষা/১৬৯
জয়ন্ত পাল

বাঙালি মুসলমান চরিত্রের মুখের ভাষা : উনিশ শতকের নির্বাচিত নাটক/১৭৯
মর্জিনা খাতুন

ছড়ার ভাষা অসম্ভবের সত্য—সত্যের অসম্ভব :
অবলম্বন রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য'/১৯০
পম্পা মুখোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোরসাহিত্যের ভাষা/১৯৯
অশোককৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা : কিছু কথা/২০৭
তিথি ঘোষ

বাংলা সাহিত্যের ভাষা বিবর্তনে গণনাট্য-নবনাট্যের অবস্থান

এ. টি. এম. সাহাদাতুল্লা

সাহিত্যের প্রধান মাধ্যম ভাষা। সাহিত্যিক তাঁর মনের বিচিত্র ভাবকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রকাশই কবিত্ব'। অর্থাৎ মনের ভাবকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারলে তবেই কবিতা সৃষ্টি হয়। বক্তব্যটি সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে আমরা মনে করি। মনের ভাব প্রকাশ করার অনেক মাধ্যম থাকলেও ভাষাই তার প্রধান আশ্রয়। ফলত সাহিত্যের ভাষা বিষয়ে সতর্ক থেকেছেন দেশ-বিদেশের সব সাহিত্যিক। বাংলা ভাষার সাহিত্যিকরাও এ বিষয়ে পিছিয়ে থাকেননি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদে তার প্রমাণ মেলে। চর্যাপদের কবিগণ তাঁদের উদ্দেশ্য ভাবনাকে সামনে রেখে সাহিত্যরচনা করলেও উদ্দেশ্যমুখিনতাই সেখানে প্রধান হয়ে ওঠেনি বা পদগুলি কেবলমাত্র বৌদ্ধ সাধকদের সাধন পদ্ধতির প্রকাশক হয়নি; তা সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠেছে। বোঝাই যায় যুগপৎ দ্বিবিধ ভাবনা মাথায় রেখে তাঁরা কলম ধরেছিলেন। চর্যাপদে ভাষার যে রূপ আমরা পাই তা বাংলা ভাষার আদি রূপ। সেখান থেকে আজ আমরা বহু পথ অতিক্রম করে এসেছি। বাংলা ভাষারও রূপ পরিবর্তন হয়েছে কালে কালে। আজকের ভাষা রূপের সঙ্গে সেদিনের কোনো মিল নেই।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ জুড়ে চলেছিল কাব্যভাষার চর্চা। উনবিংশ শতাব্দীর আগে গদ্য ভাষায় সেই অর্থে কোনো সাহিত্য রচিত হয়নি। কাব্যভাষার সেই দীর্ঘ পথ চলার ভাষা কিন্তু এক জায়গায় থেমে থাকেনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষায়ও এসেছে পরিবর্তন। চর্যাপদের কবিরা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে পাদাকুলক ছন্দকেই শেষ আশ্রয় বলে মনে করেছিলেন। মধ্যযুগের কবিরা এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিণত বোধের পরিচয় রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে আমরা পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ পেয়েছি। শুধু ছন্দগত বৈচিত্র্য নয়, ভাষাতেও এসেছে পরিবর্তন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কবিগণ নিজেদের পরিবর্তন করে নিয়েছেন। ভাষা হয়ে উঠেছে অনেক আধুনিক। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের মননে ভাষা ভাবনার যথেষ্ট প্রকাশ লক্ষ করা যায়। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের ভাষা তাই অনেক আধুনিক। ভারতচন্দ্র যখন অন্নদামঙ্গল লিখেছেন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালি তখন অনেক পথ অতিক্রম করে এসেছে। একটা সময় সাহিত্য ছিল ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। বাঙালি জীবন-ভাবনা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বাঙালি জীবন থেকে ধর্মের বাঁধন অনেক হালকা হতে শুরু করে। তারা জীবনকে নতুন করে ভাবতে শেখে। বাঙালির মানস পরিবর্তনের এই রূপরেখা ধরা আছে

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে। কাব্যের ভাষাও অনেক পরিণত। কবি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে এ কাব্যের ভাষা নির্মাণ করেছেন। এর পিছনে কাজ করেছে তাঁর আধুনিক জীবনবোধ।

কেবলমাত্র মধ্যযুগেই বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধ। নানা বিচিত্র শাখায় বিভিন্ন ধারায় রচিত হয়েছে প্রচুর সাহিত্য নিদর্শন। তবে তাদের শেষ আশ্রয় কাব্যভাষা। গদ্যভাষার চর্চা একেবারেই নেই। আসলে সেদিনের সাহিত্যিকরা ভাবতেই পারতেন না গদ্যভাষায় সাহিত্য রচনা সম্ভব। শুধু সাহিত্য কেন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও গদ্য ভাষা লিখিত আকারে বিশেষ ব্যবহৃত হতো না। উনবিংশ শতাব্দীতে এই বিষয়ে বাঙালির মোহমুক্তি ঘটে। পথপ্রদর্শক অবশ্যই ফোর্ট উইলিয়াম ও শ্রীরামপুর মিশনের পণ্ডিতবর্গ। সিভিলিয়ান কর্মচারীদের বাংলা শেখানোর উদ্দেশ্যে উইলিয়াম কেরী গদ্যভাষায় রচনা করেন 'কথোপকথন'। এ গ্রন্থের ভাষাও বেশ আকর্ষণীয়। সাধারণ সামাজিকের মৌখিক কথ্য ভাষাকেই কেরী সাহেব সরাসরি গ্রহণ করেছেন এবং তা ব্যবহার করেছেন। আসলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাংলা গদ্যের নিদর্শন সংগ্রহ ও তা শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

উদ্দেশ্য ভাবনা যাই হোক কেরী সাহেবের এই প্রচেষ্টা বাঙালিকে পথ দেখায়। সমকালীন সময়ে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয় 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' নামক দুটি পত্রিকা। বাংলা গদ্যভাষার বিকাশে পত্রিকা দু'টির অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা গদ্য ভাষাচর্চার প্রাথমিক প্রয়াস মিশনারিদের মাধ্যমে হলেও অল্পকালের মধ্যেই কয়েকজন বাঙালি মনীষী গদ্য ভাষাচর্চার দায়ভার গ্রহণ করেন। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখরা বাংলা গদ্যকে যথেষ্ট পরিণত রূপ দেন। উনবিংশ শতক বাঙালি জাতির সংস্কৃতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির স্পর্শে এই সময় বাঙালি জীবনে আসে নানা পরিবর্তন। বাঙালি তার জীবনকে সভ্যতার আলোয়, বিজ্ঞানের আলোয় আধুনিকতার রঙে রাঙিয়ে তুলতে শুরু করে। বিবিধ সামাজিক সংস্কারের পাশাপাশি বাঙালি মননেও আসে পরিবর্তন। যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে জগৎ ও জীবনকে উপলব্ধি করতে শুরু করে তারা। যার পরিচয় পাওয়া যায় সমকালীন সময়ে লিখিত রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখদের অসংখ্য প্রবন্ধে। মিশনারিদের হাতে যে গদ্যভাষার পথ চলা শুরু হয়েছিল উক্ত প্রাবন্ধিকদের হাতে তা নতুন মাত্রা পায়। বাংলা গদ্যভাষা খুঁজে পায় নতুন পথ।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাবন্ধিকরা গদ্য ভাষায় যথেষ্ট চর্চা করলেও তা ছিল সাধু গদ্য। শুধু প্রাবন্ধিকরাই নন সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও যাঁরা প্রতিভার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁরাও সাধু গদ্য ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ সাধু গদ্যরূপকেই বিশেষ আশ্রয় হিসাবে বেছে নেন। সাহিত্যে চলিত গদ্য ব্যবহার শুরু করতে বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত করেছেন বাঙালি সাহিত্যিকরা। রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে বিশেষ আলো দেখাতে পারেননি। গদ্যভাষা চর্চার পাশাপাশি বাংলা কাব্যভাষাও তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছিল। মধুসূদন দত্ত 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' রচনার তাগিদে বাংলা কাব্যভাষাকে যথেষ্ট গুরুগম্ভীর করে তুলেছেন। তাঁর পথাবলম্বন করেছেন সমকালীন সময়ের অনেক কবি। কিন্তু কেউই মধুসূদনের মতো সাফল্য পাননি। ফলত অচিরেই বাংলা কাব্যভাষায় এসেছে পরিবর্তন।

উনবিংশ শতাব্দীর আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্য রচনার ধারায় যে কাব্যভাষা কবিরা ব্যবহার করেছেন পরবর্তীতে তা অনুসৃত হয়নি। বিহারীলাল চক্রবর্তী থেকে কাব্যভাষা নতুনরূপে দেখা দিতে শুরু করে। কাব্যের বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভাষাকে গঠন করতে শুরু করেন কবি সাহিত্যিকরা। রবীন্দ্রনাথের অবদান আলোচ্য ক্ষেত্রে অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিচিত্র সাহিত্য শাখায় প্রয়োজন মতো ভাষাকে ভেঙে গড়ে নিয়েছেন। তাঁর কাব্যভাষা তাঁর রোমান্টিক ভাবের সঙ্গে সমানুপাতিক। আবার প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর মননশীল ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এবং তাঁর পরবর্তী কবিরা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কবিগণ কবিতা রচনার আদর্শ ভাবনার জায়গায় রবীন্দ্রনাথ থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের ভাষাও তদনুরূপ। প্রয়োজনমতো তাঁরা কাব্যের ভাষা সাজিয়েছেন। কবিতার ছন্দ নির্মাণেও বৈচিত্রের স্বাদ দিয়েছেন পাঠককে। উক্ত কবিদের এই প্রচেষ্টা দিনে দিনে আরও জনপ্রিয় হয়। বাংলা কাব্য কবিতার ধারায় অতি আধুনিক কালের কবিরা ভাষা ব্যবহারে আরও বেশি পরিণত বোধের পরিচয় রাখেন। বাংলা আধুনিক কবিতা যাদের হাতে প্রাথমিক ভাবে নিজস্ব পরিচয়ের খোঁজ পায় তাঁদের কবিতার ভাষাতেও যথেষ্ট জটিলতা ছিল। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রমুখদের কবিতার ভাষা মাঝে মাঝে বেশ জটিল মনে হয়। মূলত অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারের দিকে এইসব কবিদের ঝোঁক বেশি। ফলে কোনো কোনো সময় তাঁদের কবিতার কোনো কোনো শব্দের অর্থ উদ্ধারে বেশ বেগ পেতে হয়। পরবর্তী কালের আধুনিক কবিদের মধ্যে এই প্রবণতা অনেক কম। প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জয় গোস্বামীরা কবিতার ভাষাকে বেশ সরল-সাধারণ করে নিয়েছেন। এমনকি মানুষের মুখের ভাষাকে সরাসরি কবিতার শরীরে ব্যবহার করেছেন, লোকজ শব্দ ব্যবহারের প্রবণতাও তাদের বেশি। কবিতা হয়ে উঠেছে হৃদয়ের অনেক কাছের জিনিস।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেও ভাষা ব্যবহারের নৈপুণ্য কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে। নাট্যকারগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। প্রথম লগ্নে মধুসূদন বিষয় অনুযায়ী নাটকের ভাষায় পরিবর্তন এনেছেন। শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী নাটকের ভাষার সঙ্গে 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ভাষার কোনো মিল নেই। প্রহসন লেখাই হয় সামাজিক অসঙ্গতিকে নাটকের আশ্রয়ে ব্যঙ্গের কষাঘাতে বিদ্ধ করার জন্য। ফলে তার ভাষাও হয় অনেক চাঁছাছোলা।

সরাসরি লক্ষ্যে আঘাত করেন নাট্যকার। মধুসূদনের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রও ভাষা ব্যবহারে যথেষ্ট দক্ষ। তাঁর প্রহসন 'সধবার একাদশী' ও 'নীলদর্পণ' নাটকের ভাষার বিস্তর ফারাক। 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ ও 'নীলদর্পণ'-এর তোরাপের মধ্যে অবস্থাগত পার্থক্য তাদের ভাষাকে পৃথক করে দিয়েছে। কেবলমাত্র মধুসূদন বা দীনবন্ধু নন পরবর্তী কালের দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ নাট্যকার এ বিষয়ে মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

মধুসূদন দত্তের হাতে বাংলা নাটকের প্রাথমিক সূত্রপাত ঘটেছিল। পরবর্তিতে নাট্যসাহিত্য বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র শাখায় বিন্যস্ত হয়ে মহীরূহ আকার ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ এই ধারায়

অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি একা ধারণ করে আছেন নাট্য সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা। লিখেছেন অসংখ্য নাটক। ভাবনাগত দিক দিয়ে তিনি কখনও একজায়গায় স্থির থাকেননি। কাব্য নাট্যচর্চার মাধ্যমে তিনি নিজেকে মেলে ধরার প্রাথমিক প্রচেষ্টা করেছিলেন, তবে রূপক সাংকেতিক নাটকেই তাঁর প্রতিভার যথাযথ প্রকাশ। বিচিত্র আদর্শ ভাবনায় নাটকগুলি রচিত। বিষয় অনুযায়ী নাটকের ভাষাও বারে বারে বদলে নিয়েছেন তিনি। রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিসিজমের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে তাঁর নাট্য চরিত্ররা। ভাষাও হয়েছে তদনুরূপ।

বাংলা নাট্যসাহিত্য কালে কালে নানা ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। একটা সময় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাটক রচনা এক প্রকার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' বাঙালিকে নতুন পথ দেখায়। বাঙালি নাট্যকাররা প্রত্যক্ষ জীবন বাস্তবতাকে নাটকের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে শুরু করেন। নাটক যেহেতু দৃশ্যকাব্য তাই নাটকের আবেদন মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে খুব সহজে। পরাধীন ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ জীবন সমস্যাগুলোকে নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে মানুষকে সচেতন করার বিশেষ প্রয়াস কোনো কোনো নাট্যকারের মধ্যে দেখা যায়। উপেন্দ্রনাথ দাস-এর 'শরৎ সরোজিনী', 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটক দু'টি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঠিক এর পরই বাংলা নাট্যসাহিত্যের উপর নেমে আসে 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল'-এর প্রভাব। গতিরোধ হয় বাংলা নাটকের। পৌরাণিক-ঐতিহাসিক নাটকের মায়াজালে হারিয়ে যায় নাটকের জনজাগরণের উদ্দেশ্য। তবে নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল বেশিদিন বাঙালি নাট্যকারদের কণ্ঠরোধ করতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, ফ্যাসিস্ট শক্তির নির্মম অত্যাচারে বাঙালি নাট্যকারদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। একদল তরুণ নাট্যকার এগিয়ে আসেন নতুন কিছু উদ্দেশ্য ভাবনাকে সামনে রেখে। এতদিন পর্যন্ত নাটক লেখা হতো কেবলমাত্র অভিনয়ের জন্য, কলকাতার বুকে গজিয়ে ওঠা অসংখ্য পেশাদার রঙ্গমঞ্চ, শখের থিয়েটার প্রভৃতির উদর পূর্তির জন্য। কিন্তু গণনাট্য সংঘের নাট্যকাররা সরাসরি জনজাগরণের লক্ষ্যে নাটক রচনায় হাত দেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্ভব এক বিশেষ আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত ক্ষত বাঙালির মন থেকে তখনও পুরোপুরি মোছেনি। আরও এক মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে পড়ে যায় ভারতবর্ষ। মহাযুদ্ধের আগেই ব্রিটিশ সরকারের নানারকম দমনমূলক নীতির তলায় পিষ্ট হচ্ছিল ভারতবাসী। ১৯১৯ সালে রাওলাট আইন স্বাধীন মানবাত্মার প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে 'পোড়ামাটি নীতি' গ্রামীণ ভারতবর্ষকে ছারখার করে দেয়। পর পর কয়েক বছর অজন্মা, খরা প্রভৃতির প্রভাবে ততদিনে ভেঙে পড়েছিল গ্রাম বাংলার কৃষিনির্ভর অর্থনীতি। দেশবাসীর সেই দুর্দিনের মধ্যে মহাযুদ্ধের আঘাত নেমে আসে। ভারত যদিও সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়নি, ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব পড়ে দেশে। অরাজকতা, কালোবাজারি, লুণ্ঠন, অন্নাভাব, ব্ল্যাক আউটে দেশ শ্মশানে পরিণত হয়। বিশ্ব রাজনীতিও তখন একনায়কতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতির প্রভাবে রক্তাক্ত। ঢাকায় প্রকাশ্য রাজপথে ফ্যাসিবিরোধী মিছিল করার অপরাধে তরুণ লেখক সোমেন চন্দ নিহত হন ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ। এর প্রতিবাদে কলকাতায় ২৮শে মার্চ প্রগতিবাদী শিল্পী সাহিত্যিকরা একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'ফ্যাসিবিরোধী

লেখক ও শিল্পী সংঘ'। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শিল্প সাহিত্যিকদের লড়াই শুরু হয় এরপর থেকে। ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের শাখা হিসাবে বাংলায় গণনাট্য সংঘ ১৯৪২ সালেই তৈরি হয়েছিল। দেশ জুড়ে এই ধরনের আরও অনেক সংগঠন কাজ করছিল। ১৯৪০ সালে বোম্বাইয়ে 'জননাট্য' সংগঠন তাদেরই একটি।

১৯৪৩ সালের ২৫শে মে সমস্ত আঞ্চলিক সংগঠনগুলোকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় 'Indian Peoples Theater Association' বা 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'। এই সংঘের শিল্পী ও লেখক গোষ্ঠী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, বন্যা, মহামারি, কালোবাজারি, লুণ্ঠন, মুনাফাবাজি প্রভৃতিকে জনগণের সামনে নিয়ে আসার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তাঁরা গান, নাচ, নাটক, ছায়ানৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে দেশ জুড়ে মানুষের মর্মান্তিক পরিণতির কথা ও তার থেকে উত্তরণের পথ মানুষকে দেখাতে শুরু করেন। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অত্যাচারকে জনগণের সামনে নিয়ে আসা, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক অবক্ষয়ের নগ্ন চিত্র প্রভৃতিকে নাটকের বিষয় হিসাবে বেছে নেন। সঙ্গে দেখাতে শুরু করেন মুক্তির পথ। বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, শম্ভু মিত্র প্রমুখ এই সংঘের উৎসাহী কর্মীবৃন্দ।

বিজন ভট্টাচার্যের বিখ্যাত দু'টি গণনাটক 'নবান্ন' ও 'দেবী গর্জন'। নাটক দু'টি লেখা হয়েছিল সংঘের উদ্দেশ্য ভাবনাকে বাণীরূপ দেওয়ার লক্ষ্যে। এইভাবে সাহিত্য রচনা সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। একটা সময় ভাবা হতো সাহিত্য কেবলমাত্র শিল্পের জন্যই লেখা হয় এবং হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ আদর্শগত দিক দিয়ে Art For Art's Sake এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন আজীবন। ফলত তাঁর সাহিত্যের ভাষাও আদর্শগত। 'রক্তকরবী' নাটকের নন্দিনী, বিশু ও রাজার সংলাপ সাধারণ সামাজিকের মুখের ভাষার সঙ্গে মেলে না। তারা প্রত্যেকে রবীন্দ্র মানসকে বহন করে চলে। কিন্তু সাহিত্য ভাবনার রাবীন্দ্রিক মুড পরবর্তীতে চিরতরে বদলে যায়। একদল কবি সাহিত্যিক সাহিত্যকে মানুষের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার কাজে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালান। গণনাট্য সংঘ এ কাজে বিশেষ দায়িত্ব পালন করে। তবে তার পূর্বেও কিছু কবি এগিয়ে এসেছিলেন একই উদ্দেশ্য নিয়ে। রবীন্দ্রসাহিত্য কালজয়ী সত্য। তবু কোথাও যেন প্রত্যক্ষ সমাজ বাস্তবতা থেকে তা আলাদা। রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্তিকামী কবি সাহিত্যিকরা সাহিত্য ও সমাজের মধ্যের ব্যবধানকে মুছে ফেলার কাজে বিশেষ যত্নবান হন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন সাধারণ সামাজিক প্রত্যক্ষ জীবন বাস্তবতা থেকে সাহিত্য যদি সরে যায় তবে সে সাহিত্য হবে ছিন্নমূল। সাহিত্যকে তারা মানুষের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে থাকেন। গণনাট্য সংঘের সাহিত্য ভাবনা আরও উদ্দেশ্যমুখী। সাহিত্যকে তাঁরা ব্যবহার করতে চাইলেন জনকল্যাণের কাজে। এমনিতে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় নাটকের আবেদন মানুষের কাছে অনেক দ্রুত পৌঁছে যায়। গণনাট্য সংঘের কর্মীরা উপলব্ধি করেন নাট্যমঞ্চে অভিনীত বিষয়কে যদি দর্শকদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায় তবে তারা আরও বেশি উদ্দীপ্ত হবে, জীবনযন্ত্রণার নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার সাহস সঞ্চয় করতে পারবে। বিজন ভট্টাচার্যরা নাটক লিখেছিলেন জনসংগ্রামের বাণীকে জনগণের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে। তাঁদের নাটকের ভাষাও তথৈবচ।

'নবান্ন' নাটকটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় নাট্যকার বিশেষ উদ্দেশ্য ভাবনা থেকে নাটকটি লিখেছেন। নাটকের কাহিনি বিন্যাসে উদ্দেশ্য ভাবনার প্রকাশ আছে। অনাবৃষ্টি, খরা, অজন্মার প্রভাবে আমিনপুর গ্রাম আগে থেকেই অন্নাভাবে ভুগছিল। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস তাদের জীবন সংগ্রামকে থামিয়ে দেয়। মারা যায় বহু মানুষ। যারা বেঁচে থাকে তারা গ্রামের মায়া ত্যাগ করে খাদ্যের আশায় কলকাতায় পাড়ি দেয়। কলকাতায় পৌঁছেও তাদের দুঃখ ঘোচে না। রাস্তার পাশে, পার্কে, ফুটপথে খাদ্যের অভাবে ধুকতে ধুকতে বহু মানুষ মারা যায়। 'নবান্ন' নাটকের এই কাহিনি চল্লিশের বাস্তব কাহিনি। মন্বন্তরের প্রভাবে সেদিনও গ্রামবাংলা থেকে হাজার হাজার মানুষ খাদ্যের আশায় কলকাতায় এসেছিল। সমকালীন সময়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা 'ফ্যান' কবিতায় সেই বাস্তব চিত্রের প্রতিফলন পাওয়া যায়।

নগরের পথে পথে দেখেছ অদ্ভুত এক জীব
ঠিক মানুষের মত, কিম্বা ঠিক নয়
যেন তার ব্যঙ্গচিত্র বিদ্রূপ বিকৃত
তবু তারা নড়ে চড়ে কথা বলে
জঞ্জালের মত জমে রাস্তায় রাস্তায়,
উচ্ছিষ্টের আঁস্তাকুড়ে বসে বসে ধোঁকে
আর ফ্যান চায়। (ফ্যান, ফেরারী ফৌজ, প্রেমেন্দ্র মিত্র।)

চল্লিশের বাস্তবচিত্র ভাষারূপ দিতে বিজনবাবু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র অসহায় এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। 'ফ্যান' কবিতায় ফ্যান চাওয়ার প্রসঙ্গ আছে। 'নবান্ন' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে প্রধান সমাদ্দারকে দেখি বড়ো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে খাদ্যের জন্য নিদারুণভাবে হা-হুতাশ করছে। তবে ভাষাগত দিক দিয়ে দু'টো বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র অসহায় মানুষের কান্নাকে ভাষারূপ দিয়ে থেমে গেছেন, কিন্তু বিজনবাবু প্রধান সমাদ্দারের মুখে যে ভাষা আরোপ করেছেন তাতে ভাতের প্রার্থনা থাকলেও আছে আরও কিছু—

প্রধান : আর কত চেঁচাবো দু'টো ভাতের জন্য! তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু- কিছু কানে শোনো না? —'নবান্ন', দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, বিজন ভট্টাচার্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কেবল বর্ণনা করেই থেমে গেছেন। বিজনবাবু বর্ণনাকে আরও প্রাঞ্জল করে তুলেছেন। আসলে কবিতার শরীর গঠনে কবিদের কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে। নাট্যকারের ক্ষেত্রে তেমন কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। সংলাপ সেখানে নাট্যকারের ভাবনা প্রকাশের যথাযথ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। বিজনবাবু এই সুবিধাটাই গ্রহণ করেছেন। প্রধান সমাদ্দারের ভাতের প্রার্থনা তাই কেবল প্রার্থনা হয়ে থাকেনি, তার সঙ্গে মিশেছে কিছু প্রতিবাদের দ্যোতক। আমিনপুরের শোষক মহাজন হারু দত্ত। গ্রামের মানুষ যখন প্রবল অন্নকষ্টে ভুগছে হারু দত্ত সামান্য টাকার বিনিময়ে তখন কৃষকদের জমি হস্তগত করতে থাকে। প্রধান সমাদ্দারের কিছু জমি সে আগেও কিনেছে। আবার চেষ্টা করছে জমি কেনার। কিন্তু প্রধান জমি বিক্রি করবে না। হারু দত্ত কথার জাল বুনে প্রধানকে জমি বেচতে উৎসাহী করতে থাকে—

হারু দত্ত : এই যে সব সাহায্যের কথা শুনি, চাল দিচ্ছে, ডাল দিচ্ছে, খিচুড়ি খাওয়াচ্ছে, বস্তর দিচ্ছে সব ভদ্দর লোকেরা, সত্যি কথা বলতে গেলে এও তো আমার একরকম সাহায্য; মাটির বদলে টাকা দিচ্ছি। কী দাম আছে আজ মাটির বলতো। —'নবান্ন', প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য, বিজন ভট্টাচার্য।

হারু দত্ত গ্রামের মাথা, তার ভাত-কাপড়ের অভাব নেই, নিরন্ন মানুষের রক্ত শোষণ করাই তার কাজ। ভাষায়ও তার প্রতিফলন পাওয়া যায়। মানুষকে ছলে-বলে-কৌশলে শোষণ করার উপযুক্ত ভাষা তার মুখে। বিজনবাবু এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিণত বোধের পরিচয় দিয়েছেন। 'নবান্ন' নাটকের হারু দত্তের সঙ্গে 'দেবীগর্জন' নাটকের প্রভঞ্জনের মিল পাওয়া যায়। গ্রামের মহাজন প্রভঞ্জন, সে কৃষকদের বিভিন্নভাবে শোষণ করে। কৃষকদের ধান নানা কৌশলে কেড়ে নিয়ে তাদের নিঃস্ব করে দেয়। কেবল ধান কাড়ার মধ্যেই তার শোষণ সীমাবদ্ধ থাকে না। অসহায় কৃষককে ঋণের জালে বন্দি করে তার ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা সব দখল করে নেয়। মংলার বাবা সর্দারের জমি দখল করবে বলে তাকে কথার জালে বন্দি করে।

প্রভঞ্জন : ট্যাকা নাই, পয়সা নাই, তো ধার নেন কেনে ট্যাকা পয়সা আইনবন্দী খৎ দিয়া, সাই লাগবে তাত আপনার। আপনাদের দরকারে দিব নাই, ই কথাটো কোনোদিনই বুলি নাই;—বলেন কেনে? —'দেবী গর্জন', প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য, বিজন ভট্টাচার্য।

সর্দার খুব সহজেই বন্দি হয় প্রভঞ্জনের মায়াজালে। আমরা নবান্নের হারু দত্তের ভাষাতেও দেখেছিলাম একই সুর। প্রভঞ্জনও তথৈবচ। শোষকের ব্যক্তি পাল্টায়, রূপ পাল্টায়, শোষণের মাত্রা পাল্টায় কিন্তু পাল্টায় না শোষকের চরিত্র। শোষণের জায়গায় এসে হারু দত্ত ও প্রভঞ্জন তাই একই মাপকাঠিতে দাঁড়িয়ে থাকে। নাট্যকার দু'জনের মুখের ভাষাকেও ঠিক একই রকম ভাবে তৈরি করেছেন। আসলে অত্যাচারীর ভাষা কালে কালে একই থাকে। বদলে যায় অত্যাচারের চেহারা। 'নবান্ন' ও 'দেবীগর্জন' নাটকের প্রেক্ষাপট এক নয়। কিন্তু দুইজন অত্যাচারীর রূপ একই। ভাষাও তাদের চরিত্র অনুযায়ী সমানুপাতিক ভাবে এগিয়ে গেছে।

'নবান্ন' ও 'দেবীগর্জন' নাটক দু'টি লেখা হয়েছিল গণনাট্যের আদর্শ ভাবনা থেকে। গণনাট্যে অত্যাচারের বর্ণনা থাকে এবং থাকে সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমবেত জনতার প্রতিবাদ। প্রতিবাদ নিষ্ফল হয় না। বিরুদ্ধ শক্তির কাছে শেষপর্যন্ত হার মানে অত্যাচারী। আমাদের আলোচ্য 'নবান্ন' এবং 'দেবীগর্জন' নাটক দু'টিতেও প্রতিবাদের ভাষা হয়েছে ভাস্বর। নবান্নের কুঞ্জ প্রতিবাদের প্রথম নায়ক। হারু দত্ত তার কাকার জমি ছলে-বলে কিনতে চাইলে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে সে। গ্রামের মাতব্বরকে সে ভয় পায় না।

কুঞ্জ : বলি খেলাপের কথা ওঠে কিসে? হ্যাঁ গো মশায়? ওঠে কিসে খেলাপের কথা?... জমি যার সে বলছে জমি বিক্রি করবে না; আর উনি শুধু বলছে কথার খেলাপ করেছে। ভারি আমার কথা রাখনেওয়ালা রে। —'নবান্ন', প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য, বিজন ভট্টাচার্য।

ভগবানের ভয় সংগ্রামী নায়করা পায় না। ভয় পায় না সমাজ প্রভুদের চোখ রাঙানিকে। আত্মসম্মানবোধও কুঞ্জর যথেষ্ট। হারু দত্ত তাকে ছোটোলোক বলে অপমান করলে সেও তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছে- "এই গালাগালি দিয়ো না বলছি, ভালো হবে না"। প্রতিবাদের সঙ্গে মিশেছে হুমকিও। 'ভালো হবে না' কথাটি বেশ অবাক করে। নিরন্ন প্রজার মুখে এহেন

হুমকি শুনতে বেশ অবাক লাগে। কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নেই, এটিই গণনাট্যের রীতি। এর নায়ক-নায়িকাদের প্রতিবাদ করার জন্যই তৈরি করেন নাট্যকার। কুঞ্জের ভাষাও তাই চাঁছাছোলা। নবান্নের কুঞ্জর সঙ্গে মিলে যায় দেবীগর্জনের মংলার। প্রভঞ্জন ফাঁকি দিয়ে, মিথ্যা দেনার দায় দেখিয়ে চাষিদের সর্বস্বান্ত করতে চায়। খামার বাড়ি যখন ধানমাপা হয় তখন হাজির থাকে মংলা। প্রভঞ্জন চাষিদের থেকে অন্যায়ভাবে সুদ আদায় করতে চাইলে গর্জে ওঠে সে।

মংলা : বে আইনি সুদ দিব নাই। নামাই দাও পাথর, বন্ধ করি দাও মাপজোখ। —'দেবী গর্জন', মংলা, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য, বিজন ভট্টাচার্য।

মংলার গর্জনে প্রভঞ্জন চমকে যায়। মংলা কিন্তু থামে না। সমানে লড়াই চালায় অত্যাচারীর বিপক্ষে। যদিও শেষপর্যন্ত পশুশক্তির কাছে সে হার মানে। তবে তার প্রতিরোধ চোখ খুলে দেয় অসহায় নিরন্ন কৃষকদের। তারা সমবেত ভাবে প্রভঞ্জনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শেষপর্যন্ত জয়লাভ করে, নতুন পঞ্চায়েত তৈরি করতে সক্ষম হয়। নাটকের শেষ পর্যায়ে দিগম্বর, সঞ্জরিয়ারা প্রভঞ্জনের কাছ থেকে তাদের আদায় বুঝে নেয়। সে বোঝার ভাষাও পৌরুষদৃপ্ত।

দিগম্বর : এখন থেকে কৃষি ঋণ, বীজধান, আর কর্জ টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা করবে নতুন পঞ্চায়েৎ। মামলা ফৈজৎ আইনি সমঝোতা কী তার নিষ্পত্তি সকল করবে নতুন পঞ্চায়েৎ-ইসবে তুমার কী, পুরান পঞ্চায়েত কোন কথা থাকবেক নেই।। —তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, দিগম্বর, দেবীগর্জন, বিজন ভট্টাচার্য।

এতদিনের অত্যাচারিত মানুষ এবার আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়েছে। সমস্ত পাওনা সে যথাযথ ভাবে আদায় করতে চায়। আর তারা ভিক্ষাপ্রার্থী নয় মহাজনের দরবারে। গণতান্ত্রিকভাবে তারা তৈরি করেছে পঞ্চায়েত। ঠিক একই রকম প্রতিরোধের সুর শোনা গিয়েছিল 'নবান্ন' নাটকে। নাটকের শেষ পর্যায়ে কুঞ্জর ভাই নিরঞ্জন পুলিশ ডেকে মজুতদার কালীনাথকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

নিরঞ্জন : এই এঁরা দু'জন হচ্ছেন আমাদের গাঁয়ের মেয়ে, ঐ দত্ত এদের চুরি করে নিয়ে এসেছে। 'নবান্ন', দ্বিতীয়, পঞ্চম, নিরঞ্জন, বিজন ভট্টাচার্য।

হারু দত্তের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস এক সময় নিরঞ্জনদের ছিল না। আজ তারা জোর গলায় প্রতিবাদ করছে। ফলে ভাষাও হয়ে গেছে অনেক অকপট। বাক্য হয়েছে বীরত্বপূর্ণ।

'নবান্ন' ও 'দেবীগর্জন' দু'টো নাটকেরই প্রেক্ষাপট কৃষিজীবী সমাজ। অনেক বিপদ-আপদ অতিক্রম করে কৃষকরা শেষপর্যন্ত নতুন করে বাঁচার শপথ গ্রহণ করেছে দু'টো নাটকেই। উভয় ক্ষেত্রে শেষ দৃশ্যের ভাষা সাবলীল। নবান্নের প্রধান, দয়ালরা জয় করতে পেরেছে প্রকৃতির রোষকে আর দেবীগর্জনের মংলা, দিগম্বর, সর্দাররা একত্রিতভাবে পশুশক্তিকে হার মানিয়েছে। দু'টো নাটকেরই পরিসমাপ্তি প্রায় এক সুতোয় গাঁথা।

বাংলা নবনাট্যের ধারায় অন্যতম সংযোজন তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার'। বাংলা নাট্যধারায় নবনাট্যের আবির্ভাব গণনাট্যের পরবর্তীতে। গণনাট্যের উদ্দেশ্যমুখিনতা একসময় বাঙালি দর্শকদের ক্লান্ত করে দেয়, শিল্প সাহিত্যের দিক দিয়েও বিষয়টা বেশ আপত্তিকর। সত্যিই যেভাবে 'নবান্ন', 'দেবী গর্জন' সহ অন্যান্য গণনাট্যের পরিসমাপ্তি দেখানো হয়েছে তা কোনো

কোনো সময় আমাদের বিশ্বাস বোধকে পীড়িত করে। 'নবান্ন' নাটকে একদল নিরন্ন গ্রামবাসী শহর থেকে গ্রামে ফিরে দেখছে গ্রামের মাঠ ফসলে ভরে আছে। ঘটনাটি সাধারণ ভাবে মেনে নেওয়া যায় না। 'দেবী গর্জন' নাটকেও সাধারণ গ্রামবাসী যেভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছে তা যথেষ্ট বিস্ময়কর। নব নাটক এই জায়গায় আলাদা। নব নাটকে অত্যাচারীর পতন সরাসরি দেখানো হয় না, তবে সম্মীলিত প্রতিরোধ গড়ে ওঠার চিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কন করা হয়। তুলসী লাহিড়ী 'ছেঁড়া তার' নাটককে যথাযথ নবনাট্যের আদলে সাজিয়েছেন। এ নাটকের ভাষাও নাট্যকারের উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণতা দান করেছে।

'ছেঁড়া তার' নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে রহিম, ফুলজান, হাকিমুদ্দি প্রভৃতি মুসলিম চরিত্র। মুসলমানি বাংলার সার্থক ব্যবহার এখানে পাওয়া যায়। রহিম, ফুলজানরা কথায় কথায় আল্লা, রসুল, ইমান, হাদিস প্রভৃতি মুসলিম শব্দ ব্যবহার করে।

রহিম : ইমান ঠিক্ থাকলে কোন দিন হাইর হয়ে না। কোনও ডর্ নাই, মাও, ইমান মোর টিকে আছে। প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, ছেঁড়া তার, তুলসী লাহিড়ী।

ধর্মের প্রতি আস্থা মুসলমানদের অন্যতম পরিচয়। রহিম, ফুলজান আজীবন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস অটুট রেখেছে। তাদের কাছে পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা ধর্মের বিধি-নিষেধের মূল্য বেশি। ফুলজানকে তালাক দেওয়ার পর একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও রহিম তাকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। কারণ ধর্মের নিষেধ। রহিম ধর্ম বাঁচিয়ে ফুলজানকে পুনরায় বিবাহ করার চেষ্টা করে কিন্তু সফল হয় না। আত্মধিক্কারে শেষপর্যন্ত সে আত্মহত্যা করে। ফুলজানও ধর্মের কারণেই একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে যেতে পারে না স্বামীর কাছে।

ফুলজান : এইঠে থাকিলে হাদীজ খেলাপ হয় বাপৈ।
—তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, ছেঁড়া তার, তুলসী লাহিড়ী।

ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের কথায় আরবি, ফার্সি শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত বেশি। এর প্রমাণ বাঙালি সমাজে প্রচুর। আলোচ্য নাটকে নাট্যকার ফুলজান, রহিম, হাকিমুদ্দিদের সংলাপে আরবি, ফার্সি শব্দের বহুল ব্যবহার করেছেন। নাট্যকারের বাস্তববোধের পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। পর্দা প্রথা মুসলমান সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ। আলোচ্য নাটকেও পর্দা প্রথার প্রভাব লক্ষ করা যায়। শ্রীমন্ত রহিমের খুবই কাছের বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও রহিমের স্ত্রী ফুলজান তার সামনে সহজে আত্মপ্রকাশ করে না। মুসলমান সমাজের সামাজিক অনুষঙ্গকে নাট্যকার বিশেষভাবে মূল্য দেন। নাটকের নায়ক রহিম আত্মসম্মানী পুরুষ। চিরকাল সম্মানের সঙ্গে সে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তির অত্যাচারে তার সমস্ত সম্মান মাটিতে মিশে যায়। হাহাকার করে ওঠে সে। সংলাপে পাওয়া যায় সেই হাহাকারের প্রতিফলন।

রহিম : ওঃ শ্রীমন্ত। মুই ফুলজান আর বছিরকে লঙ্গড় খানায় পাঠাইছোঁ। উঃ মোক হাইর মানাইলেরে? সবাই মিলি মোর হাইর মানাইলে। —দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, ছেঁড়া তার, তুলসী লাহিড়ী।

আত্মসম্মানবোধে উদ্দীপ্ত পুরুষের হৃদয় যন্ত্রণার যথাযথ বহিঃপ্রকাশ। নাট্যকার যেন এক একটা শব্দকে বেছে বেছে নিয়ে সংলাপ তৈরি করেছেন। সংলাপ হয়ে উঠেছে চরিত্রের সার্থক প্রকাশক।

পূর্ববঙ্গের বঙ্গালি উপভাষায় 'ছেঁড়া তার' নাটকটি লেখা হয়েছে। নাটকের সমস্ত চরিত্র সেই ভাষাতেই কথা বলেছে। কেবলমাত্র রহিমের বন্ধু মহিম, মহিমের বন্ধু সুশান্ত'র কথায় বঙ্গালি উপভাষার কোন প্রভাব পাওয়া যায় না। মহিম, সুশান্তরা শিক্ষিত শহুরে মানুষ। গ্রাম্য কৃষকদের ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। নাট্যকার সচেতনভাবে এই পার্থক্য তৈরি করেছেন। শ্রীমন্ত, গোবিন্দ প্রভৃতি হিন্দুদের ভাষার সঙ্গে রহিম, ফুলজানদের ভাষার কোন মিল নেই। রহিমদের ভাষায় ইসলামি শব্দ আছে, শ্রীমন্তদের ভাষায় তা নেই। থাকাটা স্বাভাবিক নয়। যদিও থাকলেও কোন দোষের হতো না। কারণ তারা একই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের মানুষ। সমাজের অত্যাচারী চরিত্র হাকিমুদ্দি, প্রেসিডেন্টদের ভাষাও তাদের চরিত্র অনুযায়ী। উচ্চবিত্ত মানুষরা চিরকাল এক সারিতে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রেসিডেন্ট, হাকিমুদ্দিরাও তাই থেকেছে। ভাষাও তাদের অবস্থানগত একাত্মতার পরিচয় বাহক।

হাকিম : মানুষ গুলাক তোমরা কইমেন্‌- হাকিমুদ্দির মত দরাজ কলেজা কারও নাই। মুই কমো প্রেসিডেন্ট নজর আলি সাহেবের মত নজর আর দিলআলা মানুষ পয়দায় হয় নাই। দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, ছেঁড়া তার, তুলসী লাহিড়ী।

শয়তানের শয়তানি প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয় এখানে।

'ছেঁড়া তার' নবনাটক। নবনাট্যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখানো হয়। কিন্তু অত্যাচারীর পতন সরাসরি দেখানো হয় না। এ নাটকেও নাট্যকার নবনাট্যের ধারা যথাযথভাবে বজায় রেখেছেন। এখানে অত্যাচারীর পতন দেখানো হলেও তা গণনাট্যের মতো একেবারে প্রত্যক্ষ নয়। সংলাপ রচনা ও ভাষা সৃজনের অসামান্য দক্ষতায় নাট্যকার ইঙ্গিত দিয়েছেন অশুভ শক্তির পরাজয়ের।

গোবিন্দ : আর শুনাশুনি নাই। তোর দ্যাওয়ানী গিরির সয়তানী আইজে শ্যাষ। —তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, ছেঁড়া তার, তুলসী লাহিড়ী।

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জনতার দৃঢ় উচ্চারণ।

গণনাট্য, নবনাট্য বাংলা নাট্যসাহিত্য ধারার অনবদ্য সংযোজন। এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য ভাবনাকে সামনে রেখে নাটকগুলি লেখা হয়েছিল। নাটককে জনগণের দরবারে পৌঁছে দেওয়াই ছিল নাট্যকারদের মূল লক্ষ্য। নাটকগুলির ভাষা সেই উদ্দেশ্য ভাবনাকে পরিপুষ্ট করেছে। একটা সময় বাংলা চলিত গদ্যকে সাহিত্যের পাতায় স্থান দিতে কুণ্ঠা বোধ করতেন সাহিত্যিকরা। গণনাট্য-নবনাট্যের শিল্পীরা সেই ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন সাহিত্য মানুষের সম্পদ, তাই সাহিত্য হবে মানুষের জীবনের সঙ্গে সমানুপাতিক। তাঁরা চেয়েছিলেন আপামর লোক সমাজকে সাহিত্যের সীমানায় নিয়ে আসার। ফলত সাহিত্যের বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন লোক সাধারণের মুখের ভাষা। রবীন্দ্রনাথ, বিহারীলাল, বঙ্কিমের থেকে এখানেই তাঁরা আলাদা। রবীন্দ্র সাহিত্য, বিহারীলালের কাব্য প্রভৃতির সঙ্গে আমরা একাত্মতা অনুভব করলেও কোথাও যেন সূক্ষ্ম ভেদাভেদ থেকে যায়। 'ডাকঘর'-এর অমলকে ঘরের ছেলে, রক্তকরবী'র নন্দিনীকে ঘরের মেয়ে হিসাবে সাদরে বরণ করতে আমরা কুণ্ঠিত হই। পরিবর্তে কুঞ্জ, রহিম, সর্দারদের সঙ্গে

আত্মীয়তা অনুভব করা যায় সহজে। এর মূল কারণ ভাষা। কুঞ্জদের লড়াই করা, কথা বলার সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবনের মিল পাওয়া যায়। আমরাও অত্যাচারিত। আমরাও তাদের মতো প্রতিবাদ করতে চাই। গণনাট্য সংঘের কর্মীরা সাহিত্যের ভাষাকে মানুষের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সে কাজে তাঁরা যথেষ্ট সফল। তাঁদের দেখানো পথই পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যকে পথ দেখিয়েছে। এখানেই গণনাট্য-নবনাট্য শিল্পীদের সার্থকতা। বোঝাই যায় ভাষা ভাবনায় তাঁদের অবস্থান যথাযথ। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে আমরা তাঁদের সমর্থন না করে পারি না।

উৎসের সন্ধানে

১. বিজন ভট্টাচার্য : 'নবান্ন' প্রমা-সপ্তম সংস্করণ, ২০০০ সাল।
২. বিজন ভট্টাচার্য : 'দেবীগর্জন', প্রমা-প্রথম সংস্করণ-২০০১ সাল।
৩. তুলসী লাহিড়ী : 'ছেঁড়া তার', জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৪ সাল।

তথ্যের সন্ধানে

১. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'কালজয়ী বাংলা নাটক পুনর্বিচার', দিয়া পাবলিকেশন।
২. সজল রায়চৌধুরী : 'গণনাট্য কথা', মিত্র ও ঘোষ।
৩. দর্শন চৌধুরী : 'গণনাট্য আন্দোলন' অনুষ্টুপ।
৪. দিলীপ ঘোষাল : 'গণনাট্য কি কেন', গণমন প্রকাশন।
৫. বাদল সরকার : 'থিয়েটারের ভাষা'।
৬. গীতশ্রী দে (সরকার) : 'দুই শতকের বাংলা নাটকের বিবর্তন' (১৯৪৭-১৯৬৭), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।
৭. দেবব্রত বিশ্বাস সম্পাদনা : 'নাট্যদর্পণে বিদ্রোহ', এশিয়ান পাবলিকেশন।
৮. দেবনারায়ণ গুপ্ত : 'নাট্য সংলাপের বিবর্তন', এম. সি সরকার।
৯. দীপক চন্দ্র : 'বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণ চেতনা', দে'জ পাবলিশিং।
১০. বাংলা নাটকে গণ আন্দোলন : 'নির্বাচিত চিরায়ত নাটক', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।
১১. দেবেন্দ্রনাথ সরকার : 'বাংলা নাটকে জনতা চরিত্র', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।
১২. দেবব্রত বিশ্বাস : 'বাংলা নাটকে প্রতিবাদের ভাষা', একুশ শতক।
১৩. দেবব্রত বিশ্বাস : 'বাংলা নাটকে প্রতিবাদী চেতনা', নবজাতক প্রকাশন।
১৪. অজিতকুমার ঘোষ : 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং।
১৫. অজিতকুমার ঘোষ : 'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস, সাহিত্যলোক'।
১৬. শেখর সমাদ্দার : 'বাংলা নাট্য সংস্কৃতির ইতিহাস' প্রয়াগ প্রকাশনী।

“সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি
ঐতিহ্য, সংকট ও সম্ভাবনা”

সংকলন ও সম্পাদনা
ইলতুৎ ইয়াসমিন

সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি
ঐতিহ্য, সংকট ও সম্ভাবনা

সংকলন ও সম্পাদনা

ইলতুৎ ইয়াসমিন

বুকস স্পেস
হাতিয়াড়া, পূর্বপাড়া
কলকাতা-৭০০ ১৫৭

SAMAJ-SAHITYA-SANSKRITI
OITIJHYA, SANKAT O SAMBHABANA
Edited by *Iltut Yeasmin*

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০২৪
গ্রন্থস্বত্ব : মিল্লী আল-আমীন কলেজ, পার্কসার্কাস, কলকাতা-১৪
উদ্যোগ : বাংলা বিভাগ, মিল্লী আল-আমীন কলেজ

ISBN : 978-81-945021-8-0

বুকস স্পেস কর্তৃক হাতিয়াড়া, পূর্বপাড়া, কলকাতা-১৫৭ থেকে প্রকাশিত
যোগাযোগ : ৯১৪৩১৩৪৯৯৩/৭৪৩৯৭৯৮১০৪
বর্ণায়ন, হাতিয়াড়া, পূর্বপাড়া, কলকাতা-১৫৭ থেকে মুদ্রিত

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : এস.খান

বিনিময় : ৭০০ টাকা

সূচিপত্র

কথাসাহিত্য

১. দেবেশ রায়ের 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' : নিম্নবর্গীয় আখ্যানের বহুকৌণিকের বয়ান—সমরেশ মন্ডল ২১

২. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'বংশধর' উপন্যাসে পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক —ফিরোজ আলি মণ্ডল ২৮

৩. রবীন্দ্র ছোটগল্প : পোস্টমাস্টার, সুভা, ছুটি প্রকৃতি সম্পর্কিত রোমান্সের এক অবিচ্ছেদ্য কাহিনি—রিজিয়া সুলতানা ৩৬

৪. নারীর মাতৃত্বের সঙ্গে ব্যক্তি-আকাঙ্ক্ষার সংঘাত : প্রেক্ষিত সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রুহ'—টুম্পা খাতুন ৪৮

৫. 'বিড়াল-পোস্টমর্টেম' : সমাজ দেহ-মনের পোস্টমর্টেম—সুরাইয়া পারভিন ৫৭

৬. 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বিতর্কিত স্বদেশভাবনা—উজ্জ্বল মণ্ডল ৬৩

৭. সমাজ পরিবর্তনে এযুগে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা : প্রেক্ষিত অর্পিতা সরকারের 'অনুভবে তুমি'—কাজী মাসুদা খাতুন ৭৪

৮. গল্পকার গুণময় মান্নার প্রান্তীয় শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও সংসার বাস্তবতার কয়েকটি গল্প অন্বেষণ—আব্দুল সামাদ ৮৩

৯. বঙ্গীয় কীর্তন ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ : প্রসঙ্গ "প্রাণনাথ হৈও তুমি"-প্রীতম বসু —শ্রীজিতা মুখার্জী ৯০

১০. ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসারে বঙ্কিম সাহিত্যের অবদান —মহঃ আমিরুল ইসলাম ৯৬

১১. আশাপূর্ণা দেবীর 'গাছের পাতা নীল' উপন্যাসে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের বিবর্তন —প্রশান্ত কুম্ভকার ১০৪

১২. সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পে ভাগবতের পুনর্নির্মাণ—গৌরী রানী হোড় ১১১

১৩. ইতিহাসের আলোকে : নীলময়ূরের যৌবন— তৈয়েবাতুন নেসা ১১৯

১৪. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত শিশু-কিশোর উপন্যাসে কল্পবিজ্ঞান : সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সার্থক মেলবন্ধন —পাপিয়া মিত্র ১২৭

১৫. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত ছোটগল্প : প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির আত্মিক সম্পর্ক—রাকিবা সুলতানা ১৩৪
১৬. শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' উপন্যাস : বৌদ্ধধর্ম ও অন্ত্যজ জীবন সংস্কৃতির অন্বেষা—রাজেস আলি ১৪১
১৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপেক্ষিতা': একটি পর্যালোচনা —ড. দেবাংকৃতা সরদার ১৫৩
১৮. সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ঐতিহ্য সংকট ও সম্ভাবনার আলোকে তিতাস একটি নদীর নাম—প্রেমাঙ্কুর মিশ্র ১৫৯
১৯. কিন্নর রায়ের গল্পে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিপন্নতার ছবি —লুৎফান নেছা ১৬৭
২০. 'অতিথি' ছোটোগল্পের সুহাসিনী থেকে চলচ্চিত্র 'আগন্তুক'-এর অনিলা : সত্যজিতের বিজিতা—কেশবচন্দ্র সাহা ১৭৬
২১. 'দেওনদীর জল' উপন্যাস : নদীকেন্দ্রিক মানুষের সমাজজীবন ও সংস্কৃতি —চাঁদমালা খাতুন ১৮৪
২২. নন্দিতা বাগচীর ছোটোগল্পে নারী পরিসর—প্রশান্ত শীল ১৯৩
২৩. নারীবাদী বিশ্লেষণের নিরিখে ধারাস্নান—বিউটি রক্ষিত ২০০
২৪. নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে অভিজিৎ সেনের উপন্যাস 'শিরিন এবং তার পরিজন'—বাবুর আলী মণ্ডল ২০৮
২৫. আব্দুল জব্বারের ছোটগল্পে আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় সংকট —মইজুল সেখ ২১৮
২৬. মধ্যপ্রাচ্য ভাবনার নিরিখে রোকেয়ার সাহিত্যে সমাজ- সংকট ও নারী মুক্তি প্রসঙ্গ—আশাতুন নেশা ২২৭
২৭. উজ্জ্বল লালমণি বর্গিদমন-মহাগাথা : অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগজীবনের প্রতিবিম্ব —মজিনুর রহমান ২৩৬
২৮. আবুল বাশারের ছোটোগল্প : মুসলমান সমাজে নারীর অবস্থান ও আত্মমুক্তির স্বপ্ন—প্রিয়াঙ্কা প্রধান ২৪৪
২৯. দিব্যেন্দু পালিত : স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কিত কিছু কথা—আজিজুল হক ২৫১
৩০. অমিয়ভূষণের মাচক হরিণ: রাভা গোষ্ঠীর সংকট ও উত্তরণ —অনিন্দিতা রায় ২৬৩

নাটক

৩১. বিজন ভট্টাচার্যের নির্বাচিত নাটক : চল্লিশের দশকের প্রেক্ষিতে মূল্যবোধের অবক্ষয়—হাসিনুর মিএগ ২৬৯

৩২. ভক্তিভাব বাংলা নাটকে রেনেসাঁস —ড. শুভাশিস দাস ২৭৫
৩৩. অমল রায়ের নাটকে নকশাল আন্দোলন—বাণী দাস ২৮১
৩৪. সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী': উদ্বাস্তু সমস্যা ও মানবতার অবক্ষয়ের ছবি
—নাসিমা রহমান ২৯১
৩৫. শ্রমিক আন্দোলনে সম্প্রীতি : মন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট' নাটক
—পাপিয়া নস্কর ২৯৮
৩৬. উদ্বাস্তু সমস্যা ও দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক—সংহিতা ব্যানার্জী ৩০৫
৩৭. মুক্তধারা : ফিরে পড়া—অনিমেষ কুণ্ডু ৩১১
৩৮. জাতীয়তাবাদ : থিয়েটার ও গিরিশ সাহিত্যের অভিমুখ
—সুমন সরকার ৩১৯
৩৯. মোহন রাকেশের 'আধা আধুরে' নাটক : পাঠ প্রতিক্রিয়া
—এটিএম সাহাদাতুল্লা ৩২৫

লোকসংস্কৃতি

৪০. বারো মাসে বারো ষষ্ঠীব্রত : একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক মূল্যায়ন
—অভি দাস ৩৪৩
৪১. লোধা ঐতিহ্যের সংকট : জীবন ও সংগ্রামের প্রেক্ষিতে
—লক্ষীন্দর পালোই ৩৪৯
৪২. লোকভাষার বিবর্তিত ও অনন্য রূপ—ড. হাবিবা রহমান ৩৫৯
৪৩. সমন্বয় ভাবনা : লোকাচার - লোকসংস্কৃতি—ড. নুরুল ইসলাম ৩৭৩

কাব্য-কবিতা

৪৪. Revisit to Wordsworth's Select Nature Poetry in The Time of Environmental Crisis: An Ecocritical Study
—Nishat Tamanna ৩৮৩
৪৫. বাংলা গ্রামজীবন নির্ভর কবিতার পরম্পরা ও সেই ধারায় বন্দে আলী মিয়া
—নাফিসা ইয়াসমিন ৩৯০
৪৬. নয়ের দশকের কবিতা : বিশ্বায়ন, বাজার অর্থনীতি আর 'আমি'র অসুখ
—পারমিতা ব্যানার্জি সিনহা ৩৯৭
৪৭. আধুনিক বাংলা কবিতায় মানব-অস্তিত্বের বিচ্ছিন্নতার স্বরানুসন্ধান ও উত্তরণের খোঁজ—শ্রুতিপর্ণা রায় ৪০৪

মধ্যযুগ

৪৮. মনসামঙ্গলের মিশ্র সাংস্কৃতিক পাঠ: 'আঁকাই-হাঁকাই পালা'
—সৃজন দে সরকার ৪১৫
৪৯. গরীবুল্লাহের কাব্যে নারী ভাবনা—হাসিনা বানু ৪২৩
৫০. কালচারাল মিডিয়েটর : প্রসঙ্গ সত্যপীর—রবিউল আলম ৪৩৩
৫১. কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল কাব্যের প্রেক্ষিতে কালিকাদেবীর রূপ ও স্বরূপ
প্রসঙ্গ—দীপু হালদার ৪৪১
৫২. বাঙালির কৃষিসংস্কৃতি প্রসঙ্গ রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্য
—নাজমা সুলতানা ৪৪৭

বিবিধ

৫৩. সুনীতিকুমারের সংস্কৃতিচর্চা : প্রসঙ্গ বহির্ভারত—উর্বী মুখোপাধ্যায় ৪৫৭
৫৪. গুরুদেব ও ভাষাচার্য : সম্পর্কের সন্ধানে—অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ৪৬৫
৫৫. ভারতী পত্রিকা : রবীন্দ্র-সম্পাদনার ১২৫ বছর
—ড. গুরুপদ অধিকারী ৪৭২
৫৬. বামাবোধিনী পত্রিকা: মেয়েদের লেখা প্রবন্ধে মেয়েদের গার্হস্থ্য ভাবনা
—আব্দুস সামিম সেখ ৪৮৩
৫৭. উনিশ শতকে ধর্মীয় সম্প্রীতি চর্চায় কল্পনা পত্রিকা—আবদুল করিম ৪৯০
৫৮. কাজী নজরুল ইসলাম : ধূমকেতু পত্রিকা প্রসঙ্গ—মামুদ হোসেন ৫০৩
৫৯. রবীন্দ্রনাথের বৃত্তে নগেন্দ্রনাথ : একটি বেদনাদায়ক অধ্যায়
—অভিজিৎ পরামানিক ৫১১
৬০. উনিশ শতকে বাঙালিনীর বিদ্যাচর্চা : সমস্যা ও উত্তরণ
—সমতা ভৌমিক ৫১৯
৬১. অবরোধ মুক্তির এক অনন্য প্রয়াস: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
—সৈকত মিস্ত্রী ৫২৬
৬২. শিশু ও কিশোর সাহিত্যে সুকুমার রায়—কৃষ্ণা ঝুল্কী ৫৩০
৬৩. সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'মহাভারত': একটি অভিনব সাহিত্য প্রকল্প
—সম্প্রীতি বোস ৫৩৮
৬৪. বটতলা সাহিত্য: বাঙালী সমাজ জীবনে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া
—সোনালী নস্কর ৫৪৬
৬৫. নব্যভারত পত্রিকায় মঙ্গলকাব্য চর্চা—ইলতুৎ ইয়াসমিন ৫৫৩

মোহন রাকেশের 'আধা আধুরে' নাটক : পাঠ প্রতিক্রিয়া

এটিএম সাহাদাতুল্লা

হিন্দি নাটকের পট পরিবর্তনের সময় মোহন রাকেশের 'আধা আধুরে' নাটকটি লেখা। স্বাধনীতার পূর্বে হিন্দি নাটক সেই অর্থে আত্মপ্রতিষ্ঠা পায়নি। সে সময় অধিকাংশ নাটক লেখা হত নিতান্ত প্রয়োজনের নিরিখে। হিন্দি নাটক অভিনয়ের জন্য নাট্যশালাও ছিল না। প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম না থাকায় প্রতিভাধর সাহিত্য ব্যক্তিত্ব নাটকের জগতে বিশেষ প্রবেশ করেননি। স্বাধীনতার পর হিন্দি নাট্যজগৎ পরিবর্তিত হয়। বেশ কিছু নাট্যশালা তৈরি হয় পর পর। খুলে যায় সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। ধীরে ধীরে হিন্দি নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন নানা জন। এই নতুনদের একজন মোহন রাকেশ। আধুনিক হিন্দি নাটকের সঠিক পথ নির্ধারণে তাঁর নাটকগুলি বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

মোহন রাকেশের সময়কাল ভারতীয়দের জন্য বেশ কঠিন সময়। তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে দেশ। ইংরেজের যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে সবে একটু একটু করে হাঁটতে শুরু করেছে একটা নতুন জনগোষ্ঠী। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা তখন তলানিতে ঠেকলেও আধুনিকতার হাওয়ায় উড়তে শুরু করেছে অনেকেই। দেশের আর্থিক ভিত্তি দুর্বল থাকায় নতুন আলোয় আলোকিত হতে পারছিল না এরা। উচ্চবিত্ত সমাজের বাইরের প্রতিটা ব্যক্তি তখন টিকে থাকার লড়াইয়ে ব্যস্ত। এরই মধ্যে একটু একটু করে বেড়ে উঠছে এক প্রজন্ম, তারা পার করছে বাধাময় দুস্তর পথ। পরবর্তীতে এরাই মধ্যবিত্ত শ্রেণির তকমা পায়। যারা ছোটোখাটো ব্যবসা, সরকারি-বেসরকারি চাকুরি করে একটু ভালো জীবনযাপন করছিল। তবে হত দরিদ্রদের নিরিখে মধ্যবিত্তদের আলাদা করে চিনে নেওয়া গেলেও, সর্বাত্মক সুখ তাদের অধরাই ছিল। দু-চোখে তখন নতুন নতুন স্বপ্ন। কিন্তু সেগুলো করায়ত্ত করা সাধ্যের অতীত। ফলে মধ্যবিত্তের জীবনে তৈরি হতে থাকে নানা অসন্তোষ। জীবনকে উপভোগ করার ঐকান্তিক বাসনার ফলে তাদের জীবনে দেখা দিতে থাকে নানা রকম সমস্যা। মোহন রাকেশকে

এই সংকটময় মধ্যবিত্ত জীবনের সার্থক রূপকার বলা যায়। তাঁর এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত নাটকগুলিতে এই সমস্যার কথা ভাষা পেয়েছে বিশেষ ভাবে।

আধা আধুরে নাটকটি একটি পরিবারের গল্প। পরিবারের প্রধান মহেন্দ্রনাথ। তার স্ত্রী সাবিত্রী। তাদের দুই মেয়ে বিন্নী ও কিন্নী, এক ছেলে অশোক। নাটকটি শুরু হচ্ছে খুব অদ্ভুত ভাবে। সাবিত্রী অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছে, কিন্তু বাড়িতে কেউ নেই। ক্লান্ত বিধ্বস্ত সাবিত্রীর কাছে বাড়ির শূন্যতা চূড়ান্ত বিরক্তির —

> "মহিলা : (ক্লান্তভাবে) আ....হ...(একটু হতাশ স্বরে) আজও কেউ
> নেই বাড়িতে (ভেতরের দিকে তাকিয়ে)
> কিন্নী।... উত্তর দেবে কে....থাকলে তবে তো।"

সাবিত্রী বাড়ি ফেরার পর বাড়ির অন্যরা ফিরতে শুরু করে একে একে। তাদের পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নাটক এগিয়ে চলে। এই পরিবারের প্রত্যেক সদস্য মানসিকভাবে অস্থির। বাড়ির প্রধান মহেন্দ্রনাথ বেকার। একটা সময় নানা রকম ব্যবসার মাধ্যমে আর্থিক ভাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা করেছিলো। সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। জীবনের পথে ব্যর্থতার গ্লানি তাকে আহত করে প্রতি মুহূর্তে। স্ত্রী সাবিত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়। মহেন্দ্রনাথের একমাত্র ছেলে অশোক পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে আছে। কোনোরকম কাজকর্ম বা রোজগার করার চেষ্টা তার মধ্যে নেই। বাড়ির বড় মেয়ে বিন্নী একজনকে ভালোবেসে পালিয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে সেও ফিরে এসেছে বাড়িতে। ছোটো মেয়ে কিন্নী স্কুলে পড়ে। বাড়ির অসুস্থ অস্থির পরিবেশ তাকেও উদভ্রান্ত করে তুলেছে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সেও বেরিয়ে যায়। কোথায় যায় বাড়ির কেউ জানে না বা জানার চেষ্টাও করে না। বাড়ির কারও প্রতি তার শ্রদ্ধা নেই; বরং তৈরি হয়েছে এক রাশ বিতৃষ্ণা—

> ছোঃ মেয়ে : বল, বোঝা যায় কি? স্কুল থেকে ফিরে দেখি বাড়িতে
> কেউ নেই। আর এখন দেখছি তুমিও আছো, বাবাও আছে—দিদিও
> আছে—কিন্তু সবাই এমন চুপ করে আছে....।"

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সদস্য হিসাবে আমরা যদি মহেন্দ্রনাথকে এই পরিবারের প্রধান হিসাবে বিবেচনা করি, তবে সামান্য ভুল হবে। আসলে পরিবারটি টিকে আছে সাবিত্রীর রোজগারের উপর। তাই সাবিত্রীকেও পরিবারের প্রধান হিসাবে বিবেচনা করা যায়। সাবিত্রী একা রোজগার করে পুরো পরিবারকে চালিয়ে নিয়ে যায়; কিন্তু কাউকে সে ভালোবাসে না। নাটকের শুরুতেই পরিবারের প্রতি তার বিরক্তির কিছুটা পরিচয় আমরা পেয়েছি। এমনই এক অসুস্থ পরিবারের গল্প আধা আধুরে নাটক। এখন প্রশ্ন, কেন্ এমনটা হলো? কীভাবে একটা পরিবারের সকল সদস্য সকলের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল?

সাবিত্রী ও তার পরিবার সম্পর্কে খুব সহজে একটা কথা বলা যায়। এই পরিবারের প্রতিটা ব্যক্তি ভীষণভাবে আত্মিক দ্বন্দ্বের শিকার। এক সময় মহেন্দ্রনাথ ছিলো উদ্যোগী পুরুষ। তার ব্যক্তিগত ক্যারিশ্মায় সংসারে এসেছিলো স্বাচ্ছন্দ্য। নানা রকম আসবাবে ভরে উঠেছিলো তাদের বসার ঘর। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের চেষ্টা সর্বাত্মক সফলতা পায়নি। একের পর এক, যেন পর্যায় ক্রমিকভাবে ব্যর্থ হতে থাকে সে। ব্যবসার ব্যর্থতা প্রভাব ফেলে তার ব্যক্তি জীবনে। তার বসার ঘরের আসবাব শুধু লোহা লক্কড়ের ভিড় তৈরি করেছিল, বাঁধতে পারেনি সেই ঘরে ওঠা বসা করা মানুষদের। এর পিছনে দায় সবচেয়ে বেশি মহেন্দ্রনাথের। পরিবার অপেক্ষা বন্ধু মহল তার কাছে বেশি প্রিয় ছিল। বন্ধুদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতেও সে পিছুপা হত না। পরিবারকে বঞ্চিত করে মহেন্দ্র বন্ধু মহলকে খুশি রাখার চেষ্টা করত। তার বন্ধু প্রীতির সুযোগ নিত বন্ধুরা। বিষয়টা মানতে পারত না সাবিত্রী—

> "মহিলা : সত্যি নয়? তাই নয় কি? এই কাজের জন্যে আর কেউ যেতে পারবে না, মহেন্দ্রনাথ চলে যাবে।...এই বোঝা আর কেউ বইতে পারবে না, মহেন্দ্রনাথ বয়ে নিয়ে যাবে।"

মহেন্দ্রের এই আচরণ সাবিত্রীকে তিলে তিলে শেষ করে দিত। শুধু কী তাই? সময়ে অসময়ে সাবিত্রীর উপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন করত। সাবিত্রী মহেন্দ্রনাথের বন্ধুদের সঙ্গে ঠিকভাবে মিশতে পারত না, পড়াশুনা জানা মেয়ে হয়েও ভালো করে কথা বলতে পারত না বাইরের পরিবেশে। মহেন্দ্র চাইত তার বন্ধুদের খুশি করুক সাবিত্রী। খুশি করার পথ কতটা নোংরা বা কতটা সহজ-স্বাভাবিক তা নিয়ে নাট্যকার সরাসরি কিছু বলেননি। তবুও এই বিষয়ে মহেন্দ্রনাথের ব্যবহার কখনই সুস্থ স্বাভাবিক বলে আমাদের মনে হয় না—

> মহিলা :...একজন মহিলার এইভাবে চলা উচিত, এইভাবে কথা বলা উচিত, এইভাবে হাসা উচিত। কেন তুমি পাঁচ জনের সামনে আমার পজিশান খারাপ করো?...আর সেই মহেন্দ্র যে বন্ধুদের মধ্যে বসে শুধু মৃদু মৃদু হাসে, বাড়িতে এলেই বন্য জন্তু হয়ে ওঠে। জানিনা কখন কাকে আঁচড়াবে, কখন কাকে ছিঁড়ে ফেলবে। আজ রেগে নিজের শার্টে আগুন লাগিয়ে দেয়। কাল সাবিত্রীর বুকের উপর বসে তার মাথা মেঝের উপর রগড়াতে থাকে।"

বড় মেয়ে বিন্নীর কথা থেকে মহেন্দ্রের হিংস্র আচরণের আরও পরিচয় পাওয়া যায়—

> "বঃ মেয়ে : ...আপনি হয়ত ভাবতেও পারবেন না এ বাড়িতে কী ঘটে থাকে। ড্যাডি চিৎকার করতে করতে মায়ের কাপড় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা, মুখে কাপড় বেঁধে তাকে ঘরে বন্ধ করে মারা...টেনে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে কমোডের উপরে...(শিউরে উঠে) আমি এ বাড়িতে

> যেসব ভয়ানক দৃশ্য ঘটাতে দেখেছি, সে আমি বর্ণনাও করতে পারব না।"

বোঝা যায়, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্নিবার বাসনায় মহেন্দ্র এক প্রকার উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্ত্রীকে ব্যবহার করার প্রবণতা এক সময় অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করেছিল। বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থার কর্মীরা প্রমোশনসহ অন্যান্য সুবিধার জন্য এক প্রকার শোষণ করত স্ত্রী'দের। মহেন্দ্রের মধ্যে এই প্রবণতার ছায়া দেখতে পাওয়া যায় ভীষণভাবে। প্রথমদিকে সাবিত্রী বিষয়টাকে সহজভাবে মেনে নিতে না পারলেও, পরে সেটাই অভ্যাসে পরিণত হয়। একটার পর একটা পুরুষ বন্ধু বাড়তে থাকে তার।

আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য স্ত্রীকে ব্যবহার করলেও জীবনে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য মহেন্দ্র পায়নি। এরপর সংসারের প্রয়োজনে সাবিত্রীকে কাজ করতে যেতে হয়। সংসারের ভাঙন শুরু হয় এই জায়গা থেকেই। এতদিন সাবিত্রী বাইরের লোকদের সঙ্গে ঠিকঠাকভাবে মিশতে পারত না বলে অসন্তুষ্ট ছিলো মহেন্দ্রনাথ। এখন সাবিত্রীর স্বাবলম্বী হওয়াকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না সে। মহেন্দ্রনাথ আদতে কী চেয়েছিলো তা পরিষ্কারভাবে বোঝা কঠিন। এক সময় নির্মম অত্যাচার করেছিলো সাবিত্রীর উপর, এখন জীবনের শেষ প্রান্তে মনে প্রাণে ভালোবেসেছে তাকে। এই ভালোবাসাকে মূল্য দেওয়ার মত মানসিকতা সাবিত্রীর আর নেই। ফলে সংসারের মধ্যে নতুন কোনো আনন্দ খুঁজে পায় না মহেন্দ্র। এক প্রকার অসহায় হয়ে বন্ধু জুনেজার কাছে আশ্রয় নিতে হয় তাকে। সেখানেও স্থির থাকতে পারে না। বাড়ি ফেরার দুর্নিবার বাসনা নিয়ে সে জুনেজাকে সাবিত্রীর কাছে পাঠায়। জুনেজা যদি সাবিত্রীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, তাদের সংসারকে আবার আগের মত গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দিতে পারে—

> "চঃ পুরুষ : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তাই বলছি তার আজকের এই অবস্থার জন্য মহেন্দ্রনাথ নিজে দায়ী। যদি এটা সত্যি না হতো, তাহলে ও ভোরবেলা থেকে এর সম্পর্কে কথা বলে একে বোঝাবার জন্যে আমাকে এমন করে পীড়াপীড়ি করতো না।"

মহেন্দ্রনাথের সার্বিক আচরণ দেখে তার মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। স্ত্রীকে ভালোবেসে, পুত্র কন্যা নিয়ে সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে পারত সে। কিন্তু কেন্ এমনটা হল না? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে নাট্য-কাহিনির আরও গভীরে। পরে আমরা সে বিষয়ে অবগত হব। প্রথম যৌবনে মহেন্দ্রের অস্থিরতা তার সংসার ধ্বংসের অন্যতম কারণ বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মহেন্দ্র ও সাবিত্রীর দাম্পত্যে ফাটল ধরলে তার প্রভাব পড়ে সন্তানদের উপর।

পুরো পরিবারটি যেনো এক অদৃশ্য ছায়ায় আবদ্ধ হয়ে যায়। দমবন্ধ করা সেই পরিবেশে প্রতিটা মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে। বিন্নী ও অশোকের কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে সেই অস্থির পরিবেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

> ছেলে : আগেও মনে হতো কিন্তু সেই দিন থেকে এই নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম।
>
> বঃ মেয়ে : আর ভেবে বুঝতে পারলি...?
>
> ছেলে : এমন একটা কিছু আছে এ বাড়িতে...।
>
> বঃ মেয়ে : (অস্থির হয়ে) তুইও এ কথা বলছিস?
>
> ছেলে : আর কে বলে?
>
> বঃ মেয়ে : কেউ একজন...কিন্তু সে জিনিসটা কী?"

এই কথোপকথন থেকে পরিষ্কার হয় মহেন্দ্র ও সাবিত্রীর পরিবারের মধ্যে অদ্ভুত কিছু বিরাজ করে প্রতি মুহূর্তে। যার সরাসরি পরিচয় কেউ পায় না, অথচ তাকে এড়িয়েও যেতে পারে না। বাড়ির দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য বিন্নী পালিয়ে গিয়েছিলো তার মায়ের প্রেমিক মনোজের সঙ্গে। সেখানেও সুখী হতে পারেনি। মনোজের সঙ্গে তার সম্পর্ক সুস্থির হয়নি। প্রতি মুহূর্তে তাদের তাড়িত করে পুরানো স্মৃতি। প্রাথমিক আবেগ কেটে যাওয়ার পর বিন্নীর প্রতি মনোজের বিশ্বাস কমতে শুরু করে। অথচ সব দায় চাপায় বিন্নীর উপর—

> "বঃ মেয়ে : বলে, এই বাড়ি থেকে আমি আমার সঙ্গে এমন কিছু নিয়ে গেছি যা আমাকে স্বাভাবিক হতে দেয় না।"

স্বামীর অভিযোগে বিন্নী নিজেকে নানা ভাবে ভেঙে গড়ে তৈরি করতে চায়। কিন্তু ব্যর্থ হয়। অভিযাগের মর্মার্থ উদ্ধার করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে—

> "বঃ মেয়ে : আমার নিজের বাড়ি! হ্যাঁ, আমি আবার একবার সেই জিনিসটা খুঁজতে আসি যা নিয়ে ও আমাকে বার বার ছোট করে, (ভেঙে পড়ার মত অবস্থায়) তুমি বলতে পারো মা সেটা কি জিনিস? কোথায় আছে সেটা?"...কোথায় আছে সেই জিনিস যা ওর মতে আমি এ বাড়ি থেকে নিজের সঙ্গে করে নিয়ে গেছি, যা আমাদের উপর ভর করে থাকে? (মহিলার দু হাত ধরে) বল মা, কী সে জিনিস? আর সেটা এ বাড়িতে কোথায় আছে?"

বিন্নীর এই সব কাতর প্রশ্নের উত্তর সাবিত্রীর কাছে নেই। এমনটা হতে পারে, সাবিত্রীর প্রাক্তন বন্ধু হিসাবে মনোজ অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে পারে না বিন্নীকে। আবার বিন্নীও জানতো মনোজের পূর্ব ইতিহাস। ফলত তারা কোনোদিন একে অপরকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। বিয়ের অল্পকাল পরেই বিন্নী বাপের বাড়ি ফিরে আসে। এরপর তার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মানসিক অস্থিরতার বিশেষ ছায়া

দেখা যায় না। বরং বাড়ির অন্যানাদের তুলনায় তাকে খানিকটা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

বাড়ির একমাত্র ছেল অশোক। পড়াশুনা শেষ করেনি। মাঝপথে পড়া থামিয়ে বাড়িতে বসে আছে। সাবিত্রী তার জন্য একটা কাজ ঠিক করে দিলেও, বেশিদিন সেই কাজ করেনি। জীবন সম্পর্কে তার কোনো উৎসাহ নেই। মায়ের আচরণ তার ভালো লাগে না। মায়ের বন্ধুদের সহ্য করতে পারে না সে। বিভিন্ন ভাবে তাদের অপমান করে। সাবিত্রীর অফিসের বস সিংহানিয়ার প্রতি তার তীব্র ঘৃণা। সিংহানিয়ার সাহায্য নিয়ে সে চাকরি পেতে চায় না—

> "ছেলে : দরকার নেই আমার চাকরির। অন্তত ঐ লোকটার সাহায্যে নয়।"

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, মায়ের বন্ধুর প্রতি ছেলের এত বিদ্বেষ কেন? কেন অশোক তাদের সহ্য করতে পারে না। সিংহানিয়া ও সাবিত্রীর বন্ধুত্বের মধ্যে এমন কিছু আছে যা সুস্থ স্বাভাবিক নয়। সরাসরি না হলেও আশোক ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় সিংহানিয়ার উদ্দেশ্য সঠিক নয়—

> "ছেলে : পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করে। পুরো অফিস সামলায়, কিন্তু খেয়াল নেই যে নিজের প্যান্টের বোতাম....."

সাবিত্রীর পরিবারে একমাত্র অশোককেই কিছুটা সুস্থ স্বাভাবিক বলে মনে হয়। বাবা-মা'য়ের ঝগড়া সামলানোর চেষ্টা, বিপথগামী ছোট বোনকে শাসন করার মধ্যে দিয়ে সে নিজের মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। নাটকের শেষ পর্বে সে অসুস্থ মহেন্দ্রনাথকে বাড়িতে নিয়ে আসে, তার প্রতি যত্নবান হয়—

> "ছেলে : ওঠ বিন্নী, ভেতর থেকে ছড়িটা একটু বার করে দে।
> বঃ মেয়ে : (দাঁড়িয়ে) ছড়ি? কী করবি।
> ছেলে : ড্যাডিক স্কুটাররিক্শ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে। ওঁর শরীর খুব খারাপ।"

এই পরিবারের প্রতিটা ব্যক্তি যেন মানসিক রুগী। সুস্থ পারিবারিক সম্পর্ক তাদের নেই। তারা নিজেদের মধ্যে হাসে না, গল্প করে না, একসঙ্গে সময় কাটায় না। সবাই যেন সবাইকে সন্দেহ করে। বাড়ির বড় মেয়ে বিন্নী বিবাহিত। স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো না। এমন অবস্থায় সে বাড়িতে ফিরলে বাবা-মায়ের মন আনন্দে নেচে ওঠার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। সাবিত্রী-মহেন্দ্রনাথ তাকেও সন্দেহ করে। ভয় পায় বিন্নী আবার বেশিদিন তাদের কাছে থাকবে না তো—

> "প্রঃ পুঃ : মনে হচ্ছে এবারও আগের বারের মতোই এসছে। (মহিলা চায়ের কাপ এগিয়ে দেয়)
> মহিলা : চা নাও।

প্রঃ পুঃ : (কাপ নিয়ে) এনার জিনিস-পত্তর কিছুই আনেনি সঙ্গে।
মহিলা : হয়তো অল্প কিছুক্ষণের জন্যেই এসেছে।"

এই কথাবার্তার মধ্যে বিবাহিত মেয়েকে কাছে পাওয়ার আনন্দ এক বিন্দুও নেই।

'আধা আধুরে' নাটক মধ্যবিত্ত জীবনের রক্তাক্ত ইতিকথা। স্বাধীনতা পরবর্তী নবোদ্ভূত সামাজিক প্রেক্ষিতে মধ্যবিত্তদের জীবন হয়ে উঠেছিলো সর্বাত্মকভাবে অসহায়। মধ্যবিত্ত জীবনের সেই অসহায়তার কথা ভাষা পেয়েছে এখানে। সাবিত্রী ও মহেন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিল জীবনকে সুস্থির করার। পথ একটু আলাদা হলেও দুজনের উদ্দেশ্য ছিলো সমান। মহেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সঙ্গে ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছিল। প্রত্যেকবার তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অথচ তার সঙ্গীরা দিনে দিনে সমৃদ্ধির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে যায়। ব্যবসায় লাভ ক্ষতি সবসময় থাকে, তবে প্রত্যেকবার ক্ষতির ভাগ বোকা কুমিরের মতো মহেন্দ্রের পক্ষেই বিরাজ করে। কথা হল, এটা হল কেন? আমাদের মনে হয় মহেন্দ্রের সঙ্গীদের মনোগত উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্ডগোল ছিল। তারা একপ্রকার শোষণ করেছিলো মহেন্দ্রকে। নইলে এমনটা হওয়ার কথা নয়। সাবিত্রির কথাতে এই বিষয়ে কিছুটা ধারণা করা যায়—

> "মহিলা : ... এই কাজের জন্য আর কেউ যেতে পারবে না, মহেন্দ্রনাথ চলে যাবে!...এই বোঝা আর কেউ বইতে পারবে না, মহেন্দ্রনাথ বয়ে নিয়ে যাবে। প্রেস খোলা হলো, এই একই ব্যাপার, ফ্যাক্টরি চালু হলো, আবার ঐ ব্যাপার। যেখানেই কোন ফাঁক থাকবে, সেই ফাঁক ভরাট করবে মহেন্দ্রনাথ। কিন্তু ফাঁক ভরাট হয়ে গেলে, তারপর? তখন মহেন্দ্রনাথ আর কোথাও নেই।"

বোঝাই যাচ্ছে বন্ধুদের দ্বারা মহেন্দ্রনাথ ক্রমাগত শোষিত হয়েছে। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তারা মহেন্দ্রকে কেবল ব্যবহার করেছে। এখানেই মধ্যবিত্তের অসহায়তা। তারা নিজেদের সর্বাত্মক কর্মকুশলতা দিয়েও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পায় না, বা বলা যায় তাদের পেতে দেওয়া হয় না।

মহেন্দ্রের ব্যর্থতার পর সাবিত্রী চেষ্টা করেছিল পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করার। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য করায়ত্ত করার দুর্নিবার বাসনায় ন্যায়-অন্যায়ের ভাবনা মুছে ফেলেছিল সে। তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। বরং প্রতিটা ক্ষেত্রে শোষিত হতে হয়েছে তাকে। অফিসের বস সিংহানিয়া ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তাকে তোয়াজ করে ছেলে অশোকের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করতে চায় সাবিত্রী। সেই উদ্দেশ্যে সিংহানিয়াকে বাড়িতে ডাকে। এর আগেও সিংহানিয়া বাড়িতে এসেছে, কিন্তু কাজের কাজ বিশেষ হয়নি। কথা বলার সময় তার প্যান্টের বোতাম খোলা থেকেছে সব সময়। অশোকের চাকরি অপেক্ষা অন্য বিষয়েই তার মনোযোগ আটকে থেকেছে—

"ছেলে : তোমার বস্ বলে ছেড়ে দিয়েছিলাম, তা না হলে সে দিন কান ধরে ঘর থেকে বার করে দিতাম। সোফার উপরে পা ছড়িয়ে বসে ভদ্রলোক ভাবছিলেন এক কথা, উরু চুলকোতে দেখছিলেন আর এক দিকে, আর কথা বলছিলেন আমার সঙ্গে---"

এবারও সিংহানিয়ার আগমনে বিশেষ উপকার হয় না। তার মধ্যে অদ্ভুত এক ঔদাসীন্য কাজ করেছে প্রতি মুহূর্তে। সাবিত্রীর কথা সে ভালো করে শোনেও না। নিজের ভাবনাতেই মেতে থাকে সব সময়। সাবিত্রী নানা ভাবে ছেলের চাকরির বিষয়ে কথা বলতে চায়, সিংহানিয়া বার বার সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়—

"মহিলা : এককটু দেখুন, যেভাবেই হোক আপনাকে এর জন্য কিছু একটা জোগার করে দিতেই হবে।

দ্বিঃ পুঃ : নিশ্চয়ই....। কার জন্য কী করতে হবে?"

সাবিত্রী অশোককে দেখিয়ে কথাগুলি বলেছিলো, মুহূর্তের মধ্যে সিংহানিয়া তা ভুলে গিয়েছে। কতটা উদাসীন না হলে এমনটা সম্ভব। সাবিত্রী এক বুক আশা নিয়ে সিংহানিয়াকে বাড়িতে ডেকেছিলো, কথায় কথায় নিজের অসহায়তাকে প্রকাশ করছিল। কিন্তু সিংহানিয়া সে বিষয়ে একেবারেই মনোযোগ দেয়নি। বরং বড় মেয়ে বিন্নীর কাজের ব্যাপারে বার বার খোঁজ খবর নিয়েছে। তার চলাফেরার দিকে তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে। সিংহানিয়া অত্যন্ত সচেতনভাবে সাবিত্রীর আবেগকে অপমান করে এখানে। সামাজিক ও আর্থিক দিক দিয়ে সিংহানিয়া যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। তার মত মানুষ চাইলে অশোকের কাজের অভাব হয় না। অথচ সে বিষয়ে তার সামান্যতম মনোযোগ লক্ষ করা যায় না। সাবিত্রী নিজের দেহ মন সত্তা নিয়ে তার দরজায় ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে থেকেছে, আর সিংহানিয়া চূড়ান্ত অবহেলায় তাকে নিয়ে কেবল খেলা করেছে। মধ্যবিত্তদের জীবনের পরিণতি এটাই। তারা মরনপণ সংগ্রাম করে, নিজের সবটা দিয়ে চেষ্টা করে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার। এরপরও অধরা থেকে যায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। সমাজের উঁচু তলার লোক এসে তাদের সব স্বপ্ন কেড়ে নিয়ে যায়। কবি জীবনানন্দ একদা বলেছিলেন—"পৃথিবীর এই সব উঁচু লোকদের দাবি এসে/ সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।"[৯] এই কথার সত্যতা 'আধা আধুরে' নাটকে আরও একবার প্রতিপন্ন হয়।

'আধা আধুরে' নাটকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক সাবিত্রী চরিত্র। তাকে পরিমাপ করা বেশ কঠিন। নাটকের প্রথম পর্বে তাকে আমরা দেখি একজন সংগ্রামী মহিলা হিসাবে। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য হওয়ায় তার উপর অনেক দায়িত্ব। অফিস থেকে ফিরে বাড়ির অগোছালো পরিবেশ দেখে বিরক্ত হলেও গোছাতে দেরি করে না—

> মহিলা : ... এই তো বড় সাহেব আর এক কাণ্ড বাধিয়ে গেছেন। (পাজামাটা কোন মরা জন্তুর মতো তুলে ধরে কোণায় ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে ভাঁজ করতে করতে) সারাদিন বাড়িতে থেকে আর কিছু না করলেও, নিজের জামাকাপড়টা তো অন্তত গুছিয়ে রাখতে পারে। (পাজামাটা আলমারিতে রাখতে যাচ্ছিল, হটাৎ টেবিলের উপরে চায়ের সরঞ্জাম দেখে বিরক্ত হয়। পাজামা চেয়ারে ফেলে দিয়ে চায়ের বাসনগুলো তুলতে তুলতে) চা খেয়ে বাসনগুলো রান্নাঘরে রেখে আসতে পারে না। আমি এসে তুললে তবে উঠবে...।'

বাড়ির অন্যান্যদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকলেও কাউকে অযত্ন করে না। ছোটো মেয়ে স্কুল থেকে ফিরেছে। তাকে দুধ খেতে দেওয়া হয়েছে কি না সে বিষয়ে স্বামীর কাছে খোঁজ নেয়—

> "মহিলা : একার জন্যে কি দরকার ছিল পুরো ট্রে সাজিয়ে...কিন্নীকে দুধ দিয়েছো?"

একমাত্র ছেলে পড়াশুনা মাঝ পথে থামিয়ে বাড়িতে বসে আছে। সাবিত্রী ইতিপূর্বে তার জন্য কাজের জোগাড় করেছিল একবার। যদিও অশোক সেই কাজ বেশিদিন করেনি। আবার তার কাজের জোগাড় করার চেষ্টা করছে সাবিত্রী। সে চায় একটা সুস্থ সুন্দর জীবন, যেখানে টাকা পয়সা, সম্মান কোনো কিছুর অভাব থাকবে না। একার প্রচেষ্টায় পুরো সংসারকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে। এই যাত্রাপথে তাকে কতটা সংগ্রাম করতে হয় সে হিসাব কেউ নেয় না, পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করার মত মানসিকতাও কারও নেই। অথচ সুযোগ পেলে আঘাত করতে কসুর করে না কেউ। সংসারের প্রতি সাবিত্রীর প্রচেষ্টাকে কেউ সহজভাবে মেনে নিতে পারে না, বরং নোংরাভাবে অপমান করে তাকে। স্বামী মহেন্দ্রনাথ ছেলের চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য সাবিত্রীকে চেষ্টা করতে বলে। অথচ সেই প্রচেষ্টা করলে তা মানতে পারে না—

> "মহিল : নিজে হাজার বার বলবে কারুর সঙ্গে ছেলের চাকরি নিয়ে কথা বলি না কেন? আর তারই জন্য আমি যখন একটা সুযোগ তৈরি করি...।"

অশোকের চাকরির জন্য সাবিত্রীর ভাবনার অন্ত নেই। নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েও সে অশোককে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যার জন্য এত ভাবনা সেই অশোকও মা'কে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা করে না। বরং তার ভাবনা চিন্তার জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। মায়ের প্রচেষ্টার কোনো মূল্য নেই তার কাছে। সাবিত্রী যাদের সঙ্গে ওঠা বসা করে, যাদের সাহায্য নিয়ে সে পরিবারকে গড়ে তুলতে চায়, তাদেরও নিয়েও অশোকের প্রতিবাদ। সে সাবিত্রীর ভিতরকার সত্যকে অনুধাবন করতে চায়। বুঝতে পারে, সাবিত্রীর কাছে

মানুষের কোনো মূল্য নেই, মূল্য তার প্রতিষ্ঠার, তার আর্থিক পরিস্থিতির। স্পষ্ট ভাষায় সাবিত্রীর মনোগত প্রবৃত্তির প্রতিবাদ করে সে—

> "ছেলে : ...একজনকে ডাকলে, কারণ সে মস্ত বড় 'ইন্টেলেকচুয়াল'। দ্বিতীয় জনকে, কারণ তার মাইনে পাঁচ হাজার টাকা। তৃতীয় জনকে ডাকলে, কারণ সে চীফ কমিশনার। যখনই কাউকে ডেকেছ, লোকটাকে ডাক নি, হয় তার মাইনেকে, তার সুনামকে, নয়তো তার প্রতিষ্ঠাকে ডেকেছ।"

ছোটমেয়ে কিন্নী বাড়ির কাউকেই সেইভাবে সম্মান করে না। সাংসারিক জটিলতা বোঝার মত বয়স তার হয়নি। তার মধ্যে সে প্রবেশ করতেও চায় না। নিজের সুবিধা অসুবিধার গণ্ডির মধ্যে দাঁড়িয়ে বিষোদগার উগরে দেয় পরিবারের সকলের প্রতি। বাদ যায় না সাবিত্রীও। প্রবল পারিবারিক বিরোধিতার মধ্যে দাঁড়িয়েও সাবিত্রী নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকেছে। মনের দিক দিয়ে ভেঙে পড়েছে মাঝে মাঝেই। তারপরও সে পরিবারের প্রতি দায়িত্ব এড়িয়ে যায়নি, শুধু আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছে মাঝে মাঝে—

> "মহিলা : ডাকি, যাতে এ বাড়ির একটা কিছু ব্যবস্থা হতে পারে। ডাকি ; কেন না আমার একার উপরে পুরো ঘরসংসারের বোঝা; ডাকি, যাতে আর কেউ একজন আমার সঙ্গে সেই দায়িত্ব বইতে পারে। আমি যখনই কোনো প্রতিছয়াবান লোকের সঙ্গে সম্পর্ক করি সেটাও আমার জন্যে নয়, তোমাদেরই জন্য। কিন্তু তোমরা যদি এতে নিজেদের ছোট মনে করো তাহলে এসব চেষ্টা ছেড়ে দেব আমি।"

আধা আধুরে নাটকটি দু'টি পর্বে বিভক্ত। নাটকের ঘটনাও দুই পর্বে দুই রকম। প্রথম পর্বে সাবিত্রীকে আমরা যেভাবে দেখি তাতে আমাদের মনে কিছু প্রশ্নের উদয় হলেও, সামগ্রিক বিচারে তাকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। প্রথম পর্বের সাবিত্রীর সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের সাবিত্রীর মিল খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। প্রথম পর্বে তাকে দেখা যায় জীবন সংগ্রামের একনিষ্ঠ সৈনিক হিসাবে। দ্বিতীয় পর্বে তার সংগ্রমী মানসিকতায় নানা রকম গলদ চোখে পড়ে।

স্বামী মহেন্দ্রনাথকে কোনোদিন ভালোবাসেনি সাবিত্রী, তাকে একটা মানুষ বলেই মনে করত না। একটি আদর্শ ও সফল পুরুষকে নিজের পাশে দেখতে চাইত সব সময়। সে এমন এক পুরুষকে চাইত, যে সব দিক দিয়ে যথার্থ হবে। মহেন্দ্রনাথ সব দিক দিয়ে যথাযথ ছিলো না। ব্যক্তিত্ববোধ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, উদ্যোগী মন, কোনো কিছুই ঠিকঠাক ছিল না তার। ফলে সাবিত্রীর মনে মহেন্দ্রনাথের জন্য বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা-ভালোবাসা নেই—

"মহিলা : এমনি তো যে কেউ চলাফেরা করে, কথাবার্তা বলে, সেই মানুষ। কিন্তু সত্যিকারের মানুষ হতে গেলে তার নিজের মধ্যে একটা বনিয়াদ থাকা চাই যার জোরে সে নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারে — তাই না কি?"

সাবিত্রীর অনুভূতিতে মহেন্দ্রনাথ একটা মানুষই নয়—

"মহিলা : ...জুনেজা যা ভাবে, জুনেজা যা চায়, জুনেজা যা করে ওরও তাই ভাবা চাই, তা-ই চাওয়া চাই, তা-ই করা চাই। কেন? কেননা জুনেজা নিজে একটা সম্পূর্ণ মানুষ। আর ও? ও একটা সম্পূর্ণ মানুষের অর্ধেকও নয়, এক-চতুর্থাংশও নয়।"

একদিকে স্বামীর ব্যক্তিত্ব নিয়ে অতৃপ্তি, অন্যদিকে অত্যাচার; এই দুয়ের মধ্যে পড়ে এক সময় সাবিত্রীর মন বিপথগামী হয়। একটার পর একটা প্রতিষ্ঠিত পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সে। তার পুরুষ বন্ধুর তালিকা নিতান্ত ছোট নয়। অফিসের বস সিংহানিয়া, ব্যবসায়ী জুনেজা, জগমোহন, শিবজিৎ, মনোজরা বিভিন্ন সময় তার মানসিক শান্তির আশ্রয় স্থল হয়ে উঠেছে। এই ধরনের সম্পর্কের পিছনে সাবিত্রীর মধ্যে একই সঙ্গে দুই রকম বিষয় কাজ করেছে। কখনও প্রতিষ্ঠিত পুরুষের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে, আবার কখনও পারিবারিক মঙ্গল কামনায় সে জড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন জনের সঙ্গে। কারণ যাই হোক, সাবিত্রীর এই স্বভাব তার পরিবারকে উৎকেন্দ্রিক করে তুলেছিল নিঃসন্দেহে।

যতদিন মহেন্দ্র ব্যবসার কাজে যুক্ত ছিল, ততদিন সংসারে বিশেষ সমস্যা দেখা যায়নি। মানসিক অস্থিরতা থাকলেও মোটের উপর চলছিলো। মহেন্দ্রের বন্ধু জুনেজার কথা থেকে সেই পর্বে সাবিত্রীর মনের অস্থিরতা প্রকট হয়—

"চঃ পুঃ : তুমি যা কিছু বললে এইমাত্র, তাতে কোন ভুল নেই। কিন্তু বাইশ বছরের চেনা-জানার কথা নয়। আজ থেকে কুড়ি বছর আগেও একবার অনেকটা এই রকম কথাই তোমার মুখে শুনেছি...মনে আছে?"

অর্থাৎ সংসার জীবনের শুরু থেকেই সাবিত্রী কখনও সুস্থতার পরিচয় দিতে পারেনি। আজ সে সমস্ত দায় নিজের ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায়। সেখানেও বাধ সাধে জুনেজা—

"চঃ পুঃ : আমার বাড়িতে কথা হয়েছিল। তুমি বিশেষ করে কথা বলবার জন্যে এসেছিলে ওখানে আর আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলে। তখন তুমি বলেছিলে...."

জুনেজার বর্তমান যুক্তি সাবিত্রী মানতে নারাজ। পুরানো কথা সে আজ মনে রাখতে চায় না। জীবনের যাবতীয় ব্যর্থতার দায় মহেন্দ্রনাথের উপর চাপিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চায় সে। কিন্তু জুনেজাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। শেষ পর্যন্ত জুনেজা

সাবিত্রী চরিত্রের সব আবরণ আগলা করে দেয় পাঠকের সামনে —

> চঃ পুঃ : আসল কথা মহেন্দ্রের জায়গায় এদের মধ্যেই কাউকে তোমার জীবনে স্থান দিলে দু-এক বছর পরেই তোমার মনে হতো তুমি ভুল লোককে বিয়ে করে ফেলেছো। তোমার জীবনে আবার এমনই কোনো একজন মহেন্দ্র, কোনো জুনেজা, কোনো শিবজিৎ, কোনা জগমোহনের আবির্ভাব হতো যার ফলে তুমি আবার এইসব ভাবতে, এইসব বোধ করতে। তোমার কাছে জীবন বলতে একসঙ্গে কত কী হয়ে, একসঙ্গে কত কী পেয়ে, একসঙ্গে কত কী নিয়ে বাঁচা। ঐ সব কিছু তুমি কখনও একজনের মধ্যে পেতে না, তাই তুমি যার সঙ্গেই সংসার পাততে না কেন, তুমি সব সময় এমনিই রিক্ত বোধ করতে। এমনিই ছটফট করতে। তুমি দেখতে, সেই মানুষও এমনিভাবেই তোমারই আশেপাশে মাথা খুঁড়ত, কাপড় ছিঁড়ত, আর তুমি...”

সাবিত্রীর জীবনদর্শন কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। কেবল সফল পুরুষকে ভালোবাসব বা কেবলমাত্র পুরুষের সাফল্যকে ভালোবাসব, ব্যর্থতার গ্লানির ভাগ নেব না, এমন মানসিকতাকে সমর্থন করা যায় না।

নানা দোষ ত্রুটি সাবিত্রীর মধ্যে আছে। তবে এই নাটকের সবচেয়ে জটিল চরিত্র সেই। নির্দিষ্ট কেনো মাপকাঠিতে তাকে পরিমাপ করা সম্ভব না। নাটকের প্রথম পর্বের ঘটনায় তার প্রতি পাঠকের সহমর্মিতা জাগবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বজায় থাকবে না। নাট্য কাহিনির দ্বিতীয় পর্বে জুনেজার সঙ্গে তার দেখা করতে যাওয়ার প্রস্তুতির দৃশ্য যথেষ্ট অস্বস্তিকর। ছোট মেয়ে কিন্নীর স্কুলের পোশাক ঠিকঠাক নেই, ছেঁড়া মোজা পরে তাকে প্রতিদিন স্কুলে যেতে হয়। সেলাইয়ের ক্লাসে রোজ বকা খেতে হয়, সেলাইয়ের উপযুক্ত সরঞ্জামের অভাবে। মায়ের কাছে কিন্নী বার বার চেয়েও সেইসব জিনিস পায়নি, অথচ সাবিত্রীর সাজের জিনিসের অভাব নেই। একাধিক পোশাক, ব্যাগ, জুতো, কস্‌মেটিক্সে তার আলমারী ভরা। বোঝা যায়, নিজের প্রতিই বেশি ব্যস্ত থেকেছে সাবিত্রী। সংসারের অন্যদের প্রতি তার দায়িত্ববোধ লোক দেখানো। যে মা মেয়ের পড়াশুনার সরঞ্জাম কিনে দেওয়া অপেক্ষা নিজের জামা জুতো কস্‌মেটিক্স কিনতে বেশি আগ্রহী, তার মাতৃত্ববোধ নিয়ে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

আসলে সাবিত্রী চেয়েছিল জীবনকে সর্বাত্মকভাবে উপভোগ করতে। সেই লক্ষ্যে নিজেকে সব দিক দিয়ে প্রস্তুত করে ফেলেছিল। যথেষ্ট সেজে গুজে মনে স্থির পরিকল্পনা নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েও গিয়েছিল জুনেজার সঙ্গে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। শুকনো আন্তরিকতার লহরী তুলে শেষ পর্যন্ত জুনেজা তাকে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। এখন একরাশ হতাশা ছাড়া সাবিত্রীর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমরা আগেই বলেছি, সাবিত্রীকে পরিমাপ করা কঠিন। যে সংসার থেকে

চিরতরে বিদায় নিতে চেয়েছিল, বাধ্য হয়ে ফিরে এসে তার প্রতিই আবার দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। বিপথগামী মেয়েকে শাসন করা বা না করা তার নিজের ব্যাপার, বাইরের লোককে কথা বলতে দিতে সে নারাজ। বাইরের লোক জুনেজাকে সে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়—

> "মহিলা : আগেই বলেছি আপনাকে, আপনি মাঝখানে আসবেন না। আমার নিজের বাড়িতে কার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করা উচিত, আপনার চেয়ে অনেক ভালো করে আমার জানা আছে।"

এই উক্তির ঠিক কয়েক ঘন্টা আগে সাবিত্রী তীব্র ঘৃণার বশে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল। ফিরে এসে সেই বাড়িকেই নিজের বাড়ি বলে দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করছে। সাবিত্রী চরিত্রের এই বিবর্তন সত্যিই বিস্ময়কর। 'আধা আধুরে' নাটকের সাফল্যের পিছনে সাবিত্রী সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। নাট্যকারের সমস্ত বক্তব্য বিষয়কে সে একা ধারণ করেছে নিজের মধ্যে।

আধা আধুরে নাটকে সমাজের যে ছবি দেখতে পাওয়া যায় তা বড়ই মর্মান্তিক। স্কুলের ছোটো ছোটো বাচ্চারা নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। কিন্নীর সহপাঠী সুরেখা কিন্নীকে শোনায় তার বাবা মা নিজেদের মধ্যে কী করে। সামাজিক মূল্যবোধ কতটা নিচে নেমে না গেলে এমনটা সম্ভব। সামান্য তেরো বছরের মেয়ে কিন্নী। এই বয়সেই সে বুঝতে শিখেছে সামাজিক ক্ষেত্রে কোন বিষয় লুকিয়ে লুকিয়ে আলোচনা করতে হয়। তারপর ধরা পড়ে গেলে মিথ্যাকথা বলতে তার বিন্দুমাত্র বাধে না। নিজের অন্যায়কে ঢাকা দেওয়ার জন্য দাদার উপর দোষ চাপাতেও পিছুপা হয় না সে—

> "ছেলে : তুই পালালি। আমি তোকে দৌড়ে ধরে ফেলতে — তুই কাছে পিঠে সবাইকে শুনিয়ে চেঁচাতে আরম্ভ করলি—এ মায়ের কাছে আমার নামে নালিশ করে। মা বাড়িতে নেই তাই আমি তোকে মারছি।"

কিন্নীর এহেন অধঃপতন সামাজিক শিক্ষার ঘাটতিকেই পাঠকের সামনে তুলে ধরে। শুধু কিন্নী নয়, যেদিনের পুরো সমাজটাই চলে গিয়েছিল অধঃপাতে। কিন্নীর দাদা অশোক কিন্নীকে শাসন করলেও, দাদা হিসাবে উপযুক্ত দায়িত্ব সেও পালন করেনি। বরং উল্টো কাজ করেছে। নিজের মেয়েবন্ধুর উপহার ছোট বোনকে দিয়ে পাঠিয়েছে। দাদার থেকে যে বোন এমন শিক্ষা পায়, তার এমন পরিণতি হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। পারিবারিক শিক্ষার অভাব সেদিনের সমাজে প্রকট আকার ধারণ করেছিল। কিন্নীর ও সুরেখা যেসব বিষয় নিয়ে কথা বলে তা তাদের জানার কথাই নয়।

পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব শুধু কিন্নীর উপর পড়েনি। তার দিদি বিন্নীও পালিয়ে গিয়েছিল তার মায়ের প্রেমিক মনোজের সঙ্গে। আমরা বিন্নীর স্বামীর পরিচয়

দিতে 'মায়ের প্রেমিক' কথাটা ব্যবহার করেছি। খুব সহজভাবে ভাবলে এমনটা হওয়ার কথা নয়। মায়ের আবার প্রেমিক থাকবে কেন? কিন্তু আছে। একটা নয়, একাধিক। সাবিত্রী একের পর এক বাইরের পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক করেছে এবং উদ্ধতভাবে তা প্রকাশ করেছে। সেই সময় উচ্চবিত্ত সমাজের পুরুষদের ভোগাকাঙ্ক্ষাও উন্মত্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে সাবিত্রীকে ভোগ করতে তাদের বাধেনি। তারা সকলেই জানত সাবিত্রীর একাধিক সম্পর্কের কথা। তারপরও সাবিত্রী তাদের নয়নের মণি হয়ে থেকেছে। এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রমি অবস্থান নিয়েছে জুনেজা। তার কাছে সাবিত্রী বিশেষ প্রশ্রয় পায়নি।

'আধা আধুরে' নাটকের আঙ্গিক প্রচলিত ধারার নাটকের মত নয়। স্বীকার করতে বাধা নেই, এই রকম আঙ্গিকের নাটক পাঠ এই প্রথম। নাটকটির কোনো অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজন নেই। ব্যাপারটা অবশ্য খুব বেশি নতুন নয়। বাংলা নাটকে এই রীতির ব্যবহার অনেক হয়েছে। তবুও প্রচলিত ধারার নাটকের থেকে এই নাটক অনেকটা আলাদা। এখানে চরিত্রদের পরিচিতি পর্ব অনেক বেশি। নাট্য চরিত্রের এত বিস্তারিত পরিচয় সচরাচর দেখা যায় না। এই পর্বে চরিত্রদের আচার-ব্যবহার, পোষাক, বয়স ইত্যাদির নিপুণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—

> "মহিলা—চল্লিশের কাছাকাছি। মুখে যৌবনের চমক ও আর্তি এখনও রয়েছে। ব্লাউজ ও শাড়ি সাদাসিধে হলেও সুরুচিপূর্ণ। অন্য শাড়িটি বিশেষ উপলক্ষ্যের জন্য।
>
> বড় মেয়ে--বয়স কুড়ির বেশি নয়। জীবনের সঙ্গে যে লড়াই চলছে তার অবসাদ ও অস্থিরতা মুখের ভাবে স্পষ্ট ধরা পড়ে। মাঝে মাঝে বড় পাকা কথা বলে। শাড়ি মায়ের চেয় কম দামের। সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বে একটা ঢিলেঢালা ভাব।"

এইভাবে প্রতিটা চরিত্রের খুঁটিনাটি পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার। চরিত্রদের এত বিস্তৃত পরিচিতি পর্ব অবশ্যই চমকপ্রদ। এখান থেকেই চরিত্রগুলির সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা করা যায়। চরিত্রদের সম্পর্কে অনেক কথা বলা হলেও তাদের নাম জানানো হয়নি। মহেন্দ্রনাথ ও সাবিত্রীদের পরিবারের গল্প এই নাটকের মূল কথা। এই দু-জনকে প্রধান চরিত্র হিসাবে বিবেচনা করা যায়। অথচ নাটকের প্রথম পর্বে তাদের নাম জানা যায় না। নাট্যকার সংলাপ লেখার ক্ষেত্রেও চরিত্রদের নাম ব্যবহার করেননি। প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ, চতুর্থ পুরুষ, মহিলা, ছেলে, বড় মেয়ে, ছোট মেয়ে এইভাবে সংলাপ লিখেছেন। চরিত্রদের নাম জানার জন্যে পাঠককে দ্বিতীয় পর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে নাট্যকার আরও একটি নতুনত্ব নিয়ে এসেছেন। এই নাটকে যতগুলো চরিত্রের কথা আমরা পাই তারা সকলে

বাস্তবে নেই। সাবিত্রী ও মহেন্দ্রনাথ প্রধান চরিত্র। মহেন্দ্র ছাড়া আরও চার জন পুরুষ চরিত্র আছে। এদের একজন মহেন্দ্রনাথের ছেলে অশোক, বাকি তিন জন আসলে একটাই চরিত্র, যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছে। সে কখনো সিংহানিয়া, কখনো জগমোহন, কখনো জুনেজা। চরিত্রভেদে শুধু পোষাক বদলে বদলে গিয়েছে। একটা চরিত্র বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য এই তিন জনকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় না। আরও দু'টি পুরুষ চরিত্রের কথা এখানে পাওয়া যায়, এরা মনোজ ও শিবজিৎ। নাটকে এদের সরাসরি উপস্থিতি নেই। অন্যদের কথার মধ্যে দিয়ে এদের সম্পর্কে জানা যায়।

চরিত্রদের পরিচিতি পর্ব মূল নাটক থেকে আলাদা নয়। এই পর্ব চলতে চলতেই নাট্যকারের বর্ণনা শুরু হয় এবং নাটকের মূল ঘটনাও ঘটতে শুরু করে। পরিচিতি পর্বের মাঝামাঝি পর্যায়ে কালো স্যুট পরা পুরুষ কথা বলছিল। তার কথা চলতে চলতেই নাট্যকার বর্ণনা দিতে শুরু করেন--"(...মহিলার প্রবেশ। হাতে কয়েকটি জিনিস...কিছু বাড়ির, কিছু অফিসের, কিছু নিজের। মুখে সারাদিনের কাজ করার ক্লান্তি। এতগুলো জিনিস বয়ে আনার বিরক্তি আছে। জিনিস চেয়ারে রাখে। এক নজরে পুরো ঘর দেখে নেয়।)" নাট্য সংরূপের এই রকম আদল সচরাচর বিশেষ চোখে পড়ে না। সাধারণভাবে দেখা যায় নাট্যকার প্রথমে চরিত্রদের পরিচয় দেন, তারপর নাটক শুরু হয়। এই নাটকের ক্ষেত্রে এমনটা হয়নি। এই কারণে নাটকটি ঠিক কোথা থেকে শুরু হয়েছে বোঝা যায় না। আলোচ্য নাটকের শৈলী প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে চোখে পড়ে। নাটকটির কাহিনি সুস্পষ্ট দুটি পর্বে বিভক্ত। দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে 'দ্বিতীয় পর্ব' বলে উল্লেখ করা আছে। প্রথম পর্বে এইরকম কোনো উল্লেখ নেই। এর কারণ নির্দেশ করা আমাদের পক্ষে বেশ কঠিন। 'আধা আধুরে' নাটকের সংরূপ আধুনিক অ্যাবসার্ড নাটকের সঙ্গে কিছুটা মেলে। তাই একে অ্যাবসার্ড নাটক হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।

'আধা আধুরে' নাটকের ভাষাও আলাদা করে আলোচনার দাবি রাখে। মূল নাটকটি লেখা হিন্দি ভাষায়। আমরা পড়ছি বাংলায় অনুবাদ হওয়ার পর অর্থাৎ অনূদিত রূপে। ফলে এর ভাষাশৈলী বিষয়ে আমাদের আলোচনা অনুবাদকে আশ্রয় করেই অগ্রসর হবে। অন্য ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদকালে সব সময় একটা বিষয় লক্ষ করা যায়। অনুবাদকরা ভাবানুবাদ ও আক্ষরিক অনুবাদ পদ্ধতির মাঝে চূড়ান্ত দোলাচলতার স্বীকার হন। মূল নাটকের ভাবকে প্রকাশ করার জন্য উপযুক্ত শব্দ অনেক সময় পাওয়া যায় না। এই পরিস্থিতিতে অনুবাদক মূল ভাষাকে সরাসরি ব্যবহার করেন। আলোচ্য নাটকের ক্ষেত্রে এমনটা বিশেষ হয়নি। অনুবাদক প্রতিভা

THOUGHTS : ACADEMIC WRITINGS IN LANGUAGES

Chief Editor
Prof. (Dr.) Debasish Bhowmick

Managing Editor
Dr. Laksman Sarkar

Thoughts : Academic Writings in Languages

Chief Editor
Prof. (Dr.) Debasish Bhowmick, Principal
Rishi Bankim Chandra Evening College, Naihati

Managing Editor
Dr. Laksman Sarkar, Librarian

Editorial Board
Dr. Rabindranath Ghosh, Deptt of Bengali (convener)
Dr. A.T.M. Sahadatulla Head, Deptt of Bengali
Mr. Avijit Mandal Head, Deptt of Sanskrit
Prof. Chandranath Adhikari, Head, Deptt of English
Dr. Kalavati Kumari, Head, Deptt of Hindi
Mr. Anindya Chakraborty, SACT, Deptt. of English
Dr. Kushal Chatterjee, SACT, Deptt. of Bengali
for
Rishi Bankim Chandra Evening College, Naihati

Distributor
PROVA PRAKASHANI
Publisher & Book Seller
1K, Radhananth Mullick Lane
Kolkata 700 012

"THOUGHTS : ACADEMIC WRITINGS IN LANGUAGES"
By RBC Evening College
Published by Sudarshan Prakashan, Kolkata. Rs. 400/-

ISBN : 978-93-83659-82-1

Published by
Arpita Mandal
Sudarshan Prakashan
7/1C, Radhananth Mallick Lane
Kolkata 700 012
Mobile : 9433194218

Copyright
Rishi Bankim Chandra Evening College, Naihati
North 24 Parganas, West Bengal

First Published : February, 2023

All rights reseved. No part of this book may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission from the copyright holder.

Distributor:
New Pragati Prakashani
68/69 and 1039 Bakshah Bazar
Nilkhetra, Dhaka-1205, Bangladesh
and
Jnan Bichitra
11, Jaganath Bari Raod
Agartala-799001, Tripura, India

Cover: Shekhar Mondal

Printers:
Laksminarayan Press
T/31/K, Biplabi Barin Ghosh Sarani
Kolkata-700 067

Price : Four Hundred Only.

CONTENTS

চাঁদ বণিকের পালা ঃ নির্মাণ থেকে বিনির্মাণে—ড. রবীন্দ্রনাথ ঘোষ 7

সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় পেশাকেন্দ্রিক ভাষা গবেষণা ও কৃষক সমাজের ভাষা—ড. এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা 17

ঈশ্বরকথা—ড. কুশল চ্যাটার্জী 33

শ্রীমতী হে'—ড. কুশল চ্যাটার্জী 43

রবীন্দ্রমননে হিন্দমুসলিম-ভাবনা ও সম্প্রীতিবোধ—ড. কুশল চ্যাটার্জী 66

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ভিন্ন দৃষ্টিকোণের আঙ্গিনায়—অপূর্ব নন্দী 80

শ্রীউদ্ধব গীতার সাংখ্য যোগতত্ত্ব—অভিজিৎ মণ্ডল 89

"ঋগ্বেদের মন্ত্রাংশে দার্শনিক সংহতি ও একত্ব ভাবনা"—অভিজিৎ মণ্ডল 98

বাণভট্টের রচনায় চিত্রিত সমাজজীবন—অভিজিৎ মণ্ডল 112

संजीव की कहानियों में नारी—डॉ. कलावती कुमारी 117

मातादीन चाँद पर कहानी में भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था—डॉ. कलावती कुमारी 128

प्रेमचंद और स्त्री : परंपरा बनाम आधुनिकता—डॉ. कलावती कुमारी 134

फैज अहमद 'फैज' और दुष्यंत कुमार की गजलों में हिंदुस्तान की छवि —डॉ. सुनीति साउ 145

People on the margins in the stories of Bibhutibhushan —Chandranath Adhikari 149

Portrayal of Human Life in the select Poems of Jayanta Mahapatra—Anindya Chakraborty 153

UNDERSTANDING RIGHT TO INFORMATION (RTI) ACT, 2005—Dr. Santosh Kumar Tunga 163

সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় পেশাকেন্দ্রিক ভাষা গবেষণা ও কৃষক সমাজের ভাষা

ড. এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভিনিং কলেজ, নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা

ভাষার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। মানুষের জীবনের অপরাপর অত্যাবশ্যক বিষয়ের মত ভাষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের ভাষা সংগঠন তার জীবনবাস্তবতার অতিরিক্ত কোনো বিষয় নয়। সভ্যতার একেবারে প্রথম পর্বেও মানুষ পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করেছে। তবে সেদিন সুগঠিত ভাষা ছিল না। থাকলেও তার কোনো নিদর্শন নেই। নৃতাত্ত্বিকরা প্রাচীন কিছু গুহাচিত্র আবিষ্কার করেছেন। সেখান থেকে অনুমান করা যায় ভাব আদান প্রদানের প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে প্রথমাবধি ছিল। মানুষের ভাষা সম্পদ সেই প্রচেষ্টারই ফলাফল বলা যায়।

পৃথিবীর প্রথম ভাষা কোনটি তা নিশ্চত করে বলা যায় না। আজকের পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষা গুলির মধ্যে কোন্ ভাষাটির প্রত্নরূপ সেদিনের মানুষ আবিষ্কার করেছিল তাও নিশ্চিত নয়। তবে ভাষা বিষয়ে মানুষের অনুসন্ধিৎসা বহু প্রাচীন। এবং পরবর্তীতে এই জিজ্ঞাসা আরও বেড়েছে। যার ফলাফল আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্র। ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রথম পথচলা কবে শুরু হয়েছিল জানা যায়নি। তবে ভাষা বিষয়ে সৃজনশীল ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় প্লেটো, পাণিনি, দিওনুথিয়াস প্রমুখের আলোচনায়। এঁরা সকলেই দার্শনিক। দর্শনতত্ত্ব আলোচনার মাঝে ভাষা বিষয়ে যতটুকু যা বলার বলেছেন। ভাষার গঠনগত দিক নিয়েই এঁরা সীমাবদ্ধ থেকেছেন, তাত্ত্বিক আলোচনা বিশেষ করেননি। প্লেটো, পাণিনি প্রমুখকে আদর্শ ভাষাবিজ্ঞানী বলা না গেলেও তাঁদের দেখানো পথে গবেষণা করেই উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য দেশে প্রথম ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের যাত্রা শুরু হয়।

ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের পথচলা শুরু হওয়ার পর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা শাখা উপশাখায় বিভক্ত হয়েছে এই শাস্ত্র। প্রবাহমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে

গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে; গভীরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। জন্ম হয়েছে ভাষাবিজ্ঞানের একাধিক শাখার-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, উপভাষাবিজ্ঞান, সমাজভাষাবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞান প্রভৃতি। ভাষাবিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান অন্যতম। অ্যারিস্টটল বা পাণিনিরা ভাষা নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁদের হাত দিয়ে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার যে সূত্রপাত হয়েছিল পরিবর্তীকালে ফার্দিনন্দ দা স্যোসুর, নোয়াম চমস্কি প্রমুখ তাকে পূর্ণ মাত্রা দেন এবং বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পায়। জার্মান ভাষাবিজ্ঞানীরাও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেকে ভাষা বিষয়ে নানাবিধ চর্চায় ব্রতী হন। তাঁদের এই ক্রিয়াশীলতার সূত্রে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম হয় সমাজভাষাবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞান প্রভৃতির।

ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের ধারায় সমাজভাষাবিজ্ঞান বা Sociolinguistics একটি অতি নবীন শাখা। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লস এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে শাস্ত্রটির পথ চলার সূত্রপাত। Sociolinguistics শব্দটির বিকল্প রূপে ইংরাজি ভাষায় আরও কিছু শব্দ প্রচলিত আছে। যেমন Sociology of Language. শব্দটি ব্যবহার করেছেন জে. এ. ফিশম্যান। সমাজভাষাবিজ্ঞানের উপর তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের নামে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তিনি। Sociology of Language এর একটি সহজ সংজ্ঞা দিয়েছেন উইলিয়াম ব্রাইট। তাঁর দেওয়া সংজ্ঞাটি হল—**"The Sociology of Language is potentially a huge area, encompassing the full range of relations between language and society."**[১]

Sociolinguistics বা Sociology of Language কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' কথাটি বিশেষভাবে প্রচলিত। বাংলায় সমাজভাষাবিজ্ঞানের অনেক সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। যেমন রামেশ্বর শ' বলেছেন—"ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক আলোচিত হয় তাকেই আমরা সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান বলি।"[২] আবার রাজীব হুমায়ুন সমাজভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসাবে বলেছেন—" সমাজ-সংগঠন মাঝে

মাঝে ভাষা-সংগঠনকে প্রভাবিত করে। ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষা-সংগঠনের ওপর সমাজ-সংগঠনের প্রভাব বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হয়, তাকে সমাজভাষাবিজ্ঞান বলে।"[৩] সংজ্ঞাগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় ভাষা ও সমাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানুষের ভাষা সংগঠন বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয় সমাজের দ্বারা। ভাষার উপর সমাজের নানাবিধ প্রভাব বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় সমাজভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রে।

মানুষ যে সমাজে বাস করে সেই সমাজ স্থান, কাল, পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়। কোনো নির্দিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট কোনো জনবসতির মধ্যে সামাজিক স্তর বিন্যাস লক্ষ করা যায়। মানব সমাজের বিচিত্রসব সমীকরণ মানুষের ভাষা সংগঠনকে প্রভাবিত করে। আমাদের সমাজ নানা শ্রেণিতে বিভক্ত। কখনো এই শ্রেণিভেদ তৈরি হয় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে--উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রভৃতি। আবার কখনো জাতিভেদে সমাজভেদ তৈরি হয়—হিন্দু সমাজ, মুসলিম সমাজ, বৌদ্ধ সমাজ, খ্রিস্টান সমাজ ইত্যাদি। শিক্ষা ভেদে, বয়স ভেদে, পেশা ভেদেও সমাজভেদ দেখা যায়। সামাজিক এইসব শ্রেণিভেদ ভাষার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, পরিবর্তিত হয় ভাষার স্বরূপ। এইসব পরিবর্তন ও তার অন্তর্নিহিত রহস্যের অনুসন্ধান এবং স্বরূপ বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক বা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মাবলীর দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের দিক দিয়ে বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। ফলত প্রশ্রয় পায় সমাজভাষাবিজ্ঞানের ধারণা। সমাজভাষাবিজ্ঞানে ভাষা সংগঠনের উপর সমাজ সংগঠনের প্রভাব আলোচনা করা হয়। ভাষা সংগঠনের উপর সমাজ সংগঠনের প্রত্যক্ষ প্রভাবকে চিহ্নিত করা এবং তার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ একজন সমাজভাষাবিজ্ঞানীর প্রধান আলোচ্য বিষয়। ভাষা-বৈচিত্র্যের স্বরূপ অন্বেষণ, কারণ বিশ্লেষণ ও তার উপযুক্ত বর্ণনা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য। সামাজিক সূত্র, সামাজিক সংগঠন এবং সামাজিক পরিস্থিতির সাপেক্ষে ভাষা সংগঠনের স্বরূপ পর্যালোচনা সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর বাইরে বহু ভাষা পরিস্থিতি, স্ল্যাং এর ব্যবহার, অপরাধ জগতের কোড ল্যাঙ্গুয়েজ, অশালীন ভাষা, একজন মানুষের মনের বিচিত্র গতির সাপেক্ষে ভাষাভেদ এসবই সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকার মধ্যে পড়ে। তত্ত্বগত দিক দিয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা—গোপন

সংকেতের ভাষা, ভাষা বৈচিত্র্য, সামাজিক সূত্র ও ভাষা সূত্রের পারস্পারিক সম্পর্ক ও বহুভাষা পরিস্থিতি। একজন সমাজভাষাবিজ্ঞানী সমাজভাষার চর্চা করতে বসে কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হবেন অর্থাৎ সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানা ঠিক কতদূর তা নিয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানী ফিশম্যান একটি নির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে—**".. including not only language uses per se, but also language attitudes and overt behavours toward language and toward language uses."**[8] অর্থাৎ সমাজ সংগঠনের সঙ্গে ভাষা ব্যবহারের সম্পর্ক বিষয়ে যাবতীয় দিক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠীর সম্পর্কের মূলে থাকে সামাজিক অনুষঙ্গ ও সামাজিক মানুষের মনোভাব ও আচরণ।

ফিশম্যান ছাড়াও সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানা ও স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী ম্যাকডেভিট, উইলিয়ান ব্রাইট, উইলিয়াম লেবোভ, মৃণাল নাথ কিছুটা নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছেন। দেশ বিদেশের ভাষাবিজ্ঞানীরা সমাজভাষার সীমানা বিষয়ে যে সব মতামত দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানী ফিশম্যানের মতামতকে আমরা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। ফিশম্যানের মতানুসারে সমাজভাষাবিজ্ঞানকে তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা—

ক. বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান।

খ. সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান।

গ. প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান।

প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানে ভাষার পরিকল্পিত প্রয়োগের দিকটি আলোচনা করা হয়। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উৎকৃষ্ট পদ্ধতির আবিষ্কার, অনুবাদ নিয়ে গবেষণা ও নীতি নির্ধারণ, বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার বাহন বা মিডিয়া নিয়ে গবেষণা, লিপি প্রণালীর উদ্ভাবন, পরিমার্জন ও সংশোধন ইত্যাদি বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়। সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞানে ইতিহাসের আলোকে ভাষাকে বিশ্লেষণ করা হয়। অর্থাৎ সমাজভাষার উদ্ভব কীভাবে হয়েছে? ভাষার বিবর্তন কোন্ পথে ঘটেছে সেই সব বিষয় এখানে আলোচিত হয়। প্রয়োগমূলক ও পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকার বাইরে আর যা কিছু বিষয় তার সবই বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। ভাষাবিজ্ঞানী ফিশম্যানের আরও একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি

বলেন—"**Descriptive sociology of language seeks to answer to the question who speaks(or with), what language (what language variety) to whom and when and to what end?**" [৫] সমাজভাষার প্রেক্ষিতে বক্তা, শ্রোতা, ভাষা ব্যবহারের উপলক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, সমাজভাষার রূপ ইত্যাদি যদি বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের মূল সূত্র হয় তবে পেশাকেন্দ্রিক ভাষা গবেষণা ও তৎসূত্রে কৃষক সমাজের ভাষা অবশ্যই বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকাধীন।

২

সমাজভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত। আমাদের দেশে সম্প্রতি এই বিস্তৃত ক্ষেত্রের অংশ বিশেষের কর্ষণ শুরু হয়েছে। লিঙ্গ ভেদে ভাষাভেদের বিষয়টা আজ যথেষ্ট আলোচিত। মেয়েদের ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন সুকুমার সেন, নির্মল দাস, শর্মিলা বসুদত্ত, সাইফুল্লা প্রমুখ। ধর্মভাষা, জাতিভাষা, নৃভাষা ইত্যাদি বিষয়েও কমবেশি আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু পেশাভিত্তিক ভাষা গবেষণার বিষয়টি বর্তমানে বেশ পিছিয়ে। তবে এই বিষয়ে গবেষণা যে একেবারেই হয়নি এমন নয়। কিছু কিছু কাজ হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় যা নিতান্ত নগন্য। অপরাধ জগতের ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক। তাঁর গবেষণালব্ধ গ্রন্থটি হল-"*অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ।*" বর্ধমান জেলার মুচিদের ভাষা নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন সুকুমার সেন। তাঁর—"***The cust dialect of the muchis in south-east Burdwan***" প্রবন্ধটি Indian linguistics, volume-16, ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। খুলনা জেলার মাঝিদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর রচনার নাম—"*খুলনা জেলার মাঝির ভাষা।*" প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ-৩১, দ্বিতীয় সংখ্যায় ১৩৩১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। কামার শালের ভাষা প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে অশোক কুমার কুণ্ডু রচিত "*কামারশালের ভাষা*" প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে কৌশিকী পত্রিকায়। বারবনিতাদের পেশা কেন্দ্রিক ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম "*বারবনিতার ভাষা*"।

পেশাভিত্তিক ভাষা গবেষণার এই দৃষ্টান্ত খুবই সামান্য, কারণ পেশাভেদে ভাষাভেদের উদাহরণ বাংলায় প্রচুর এবং সমস্ত পেশারই নিজস্ব কিছু শব্দকোষ, শব্দবন্ধ থাকে। তাই এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া উচিত বিস্তৃত পরিসরে। প্রসঙ্গত

উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষায় পেশাভিত্তিক ভাষা গবেষণা যেটুকু হয়েছে তাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের "অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ" পেশাভিত্তিক গবেষণার ধারায় অনন্য উদাহরণ। এই গ্রন্থে লেখক অপরাধ জগতে ব্যবহৃত বহু শব্দের উদাহরণ ও তাদের ব্যবহার প্রেক্ষিত দেখিয়েছেন। যেমন- 'টিকটিকি', 'মামা', শব্দগুলি অপরাধ জগতে পুলিশকে ইঙ্গিত করে। 'পেটো' শব্দটি 'বোম' কে ইঙ্গিত করে।

সুকুমার সেন "বর্ধমানের মুচিদের ভাষা" প্রবন্ধে মুচিদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটিও কর্মকেন্দ্রিক ভাষা গবেষণার নমুনা। প্রচলিত হিন্দু সমাজে মুচিরা নীচু এবং অচ্ছুৎ শ্রেণি। যারা চামড়ার কাজ করে, জুতো তৈরি করে এবং ঢাক বাজায় তারা সকলেই মুচি সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে। ড. সেন বলেছেন—"*অতি সম্প্রতি আমি জানতে পেরেছি, বর্ধমান জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে মুচিরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় তাঁদের এক নিজস্ব উপভাষা (ডায়ালেক্ট) ব্যবহার করেন। এই মুচি সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা চামড়ার কাজ করেন, জুতো তৈরি করেন এবং ঢাক বাজান—তাঁরা সকলেই আছেন। তাঁদের উপভাষার এক সম্পূর্ণ শব্দভাণ্ডার আছে—তার সাহায্যে তাঁরা সাধারণ বস্তু বা ভাবকে চিহ্নিত করেন। ওই অঞ্চলের মান্য উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা থেকে এই শব্দভাণ্ডার সম্পূর্ণ পৃথক।*"[৬] ড. সেন মুচিদের পেশা কেন্দ্রিক ভাষার বহু নমুনা পরিবেশন করেছেন। যেমন—ভিট্- চাষের জমি, বিশেল—পর্যাপ্ত, ফোঁপাসু—সাপ, বইটান—রান্নাভাত, ভোড়েল—মদ বিক্রেতা ইত্যাদি। খুলনা জেলার মাঝিদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর প্রবন্ধের নাম—'*খুলনা জেলার মাঝির ভাষা*'। নৌকা চালানো মানুষের আদিম জীবিকা। অতি প্রাচীন কাল থেকে মানুষ নৌকার সাহায্যে নদী পথে যাতায়াত করে। যারা নৌকা চালায় তাদের মাঝি বলে। খুলনা জেলার মাঝিদের ভাষা সেখানকার আঞ্চলিক ভাষা থেকে কিছুটা আলাদা। গবেষক বলেন—"*পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থিত খুলনার উচ্চারণ কতকটা পূর্ববঙ্গের মতো, আবার কতকটা পশ্চিমবঙ্গের মত। আবার অনেক স্থলে তাহার উচ্চারণে একটা স্বাতন্ত্র্যও আছে।*"[৭] লেখক উদাহরণের সাহায্যে এই স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রবন্ধে গবেষক মাঝিদের ভাষার যে নমুনা পরিবেশন করেছেন তার কিছুটা এই রকম-- নাও বা লাও—নৌকা,

চোড়—লগি, গোলোই—নৌকার অগ্রভাগের ত্রিভূজাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড, টাবুরে নাও—ছোটো নৌকা প্রভৃতি। পেশাভিত্তিক ভাষা গবেষণার পরম্পরায় অশোককুমার কুণ্ডু'র *'কামারশালের ভাষা'* প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কামারশালের পরিবেশ, কামারশালে তৈরি ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও কামারশালার ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কামারশালের পরিবেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন— *"কামার ঘরের দরজা বাঁশেরই হয়, খুব একটা মজবুত কিন্তু হয় না। চৌকাট থেকে ঢোকার মুখেই মাথাটা একটু নিচু করতে হয়, না হলে ওপরে 'গোবরা কাঠে' মাথা ঠুকবে। কামারশালা আসলে চালাঘর। দেওয়ালের পাট বেশি থাকে না। উচ্চতা বেশি হয় না। ঘরের ভিতরে নামমাত্র জানালা থাকে। একে জানালা না বলে ঘুলঘুলি বলাই ভালো।"*[৮]

আমাদের সমাজের কিছু নারী তাদের শরীরের বেসাতি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এইসব নারীরা বারবনিতা বলে পরিচিত। দেহকে বিক্রি করা বর্তমানে একটা পেশায় পরিণত হয়েছে। বহু নারী প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। বারবনিতাদের পেশা কেন্দ্রিক ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রবন্ধের নাম *'বারবনিতার ভাষা'*। এ প্রবন্ধে গবেষক বারবনিতাদের জীবন ও কর্মের নানা পরিচয় দিয়েছেন। সে প্রসঙ্গে উঠে এসেছে তাদের কর্মমূলক ভাষা প্রসঙ্গ। গবেষক বলেছেন বারবনিতারা তাদের শরীরকে 'মেসিন' নামে পরিচিত করে—*"মেসিনকে ঝেড়েমুছে পরিষ্কার রাখতে হয়। আমরাও আমাদের দেহকে তেলসাবান মেখে পরিষ্কার রাখি; তা নইলে কি কেউ মুখ দেখে পয়সা দেবে!"*[৯] স্বেচ্ছায় কেউ বেশ্যাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে বেছে নেয় না। সমাজের পাশবিক অত্যাচারে পরাজিত হতে হতে কোনো এক সময় কোনো কোনো নারী এই পথে পা বাড়ায়। তারপর দিনের পর দিন চলে অন্তরে অন্তরে রক্তক্ষরণ। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক এক যৌনকর্মীর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। মন্তব্যটি হল--*"রোজ রোজ অচেনা লোককে নিজের শরীরটা দেখাতে কারোর ভালো লাগে বলুন!"*[১০] দিনের পর দিন নারীত্বের অসহায় লাঞ্ছনার ইতিকথা এই মন্তব্যে পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। সব মিলিয়ে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি পেশাকেন্দ্রিক ভাষার আলোচনায় এক অসামান্য দলিলে পরিণত হয়েছে। নারী ভাষা নিয়ে কাজ করেছেন গবেষক ড. সাইফুল্লা। তাঁর গবেষণা সন্দর্ভ *'উত্তর চব্বিশ পরগণা*

*জেলার নারী ভাষা'*য় বারবনিতাদের ভাষার কিছু নমুনা উদ্ধৃত হয়েছে। গবেষক যৌনকর্মীদের ভাষা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি ও ধান্যকুড়িয়ায় অবস্থিত পতিতা পল্লিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে যৌনকর্মীদের পেশা কেন্দ্রিক ভাষার নমুনা সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সংগৃহীত নমুনা যেমন—গবেষক : তোমার শরীর এত খারাপ ক্যান?

যৌনকর্মী : শরীর আর কী করে ভাল হবে, সারাক্ষণ তো জেনাটার চলতিই আছে।[১১]

উদ্ধৃত সাক্ষাৎকার থেকে যৌনকর্মীদের ভাষা বৈশিষ্ট্য বিষয়ে নানা তথ্য পাওয়া যায়। যৌনকর্মীদের মধ্যে কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহারের প্রবণতা অনেক বেশি। এখানে 'জেনাটার' শব্দটি কোড ল্যাঙ্গুয়েজের উদাহরণ। নারীদের ভাষায়ও তাদের কর্ম সংস্কৃতির প্রভাব আছে। কারণ আমাদের সমাজের নারীরা এখন আর কেবলমাত্র গৃহবধূ নয়। গৃহ পরিবেশের বাইরে যে বিরাট কর্মজগৎ–বর্তমানের নারীরা তারও অংশীদার। যেমন কৃষি জমিতে কাজ করা নারীর কথা- ***"আমি মাঠে মাঠে জোন খেটে, বুকির রক্ত জল করব, আর উনি মদ্দালোক মাল খেয়ে চিৎ হয়ে থাকবে। ছেলেমেয়ে গুলো সারাদিন ডা ডা করবে! এমন হতে পারে না।"*** শ্রমজীবী মহিলাদের মধ্যে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়। কিন্তু কৃষি শ্রমিকরা থেকে যায় গ্রামেই। তাই তাদের ভাষায় নাগরিকতার রং লাগে না। বুকির রক্ত জল করা গ্রাম্য ভাষারীতিজাত। এ ভাষা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যবহার করে। মেয়েরা যখন কর্মের ক্ষেত্রে পুরুষদের সহাবস্থান নিচ্ছে তখন ভাষা ব্যবহারের এই সহাবস্থান স্বাভাবিক। মাল খেয়ে চিৎ হয়ে থাকা, কঠিন জীবন অভিজ্ঞতার পীড়নে পীড়িত মেয়েদের মুখেই এ ভাষার ব্যবহার সম্ভব। জীবনে বাস্তবতার পীড়ন যতই মারাত্মক হোক, তা নারীর সজীব কোমল প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করতে পারে না। এক্ষেত্রেও তা হয়নি। সন্তান সন্ততির অনুষঙ্গে ভাষা তার যাবতীয় রুক্ষতা হারিয়ে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। *'ডা ডা করে'* এই ছোট্ট বাক্যবন্ধটি মাতৃ হৃদয়ের বহু রক্তরাঙা অনুভূতিকে চিনিয়ে দেয়। পুরুষের বাক্ ভাণ্ডারে সংক্ষিপ্ত অথচ এত তীক্ষ্ণ ভাষা বোধহয় নেই, যা দিয়ে এত সহজে পুরুষের সন্তান স্নেহকে চিনে নেওয়া যায়। কর্মভেদে মেয়েদের মধ্যে ভাষাভেদ ঘটে সত্য, কিন্তু তা শেষ সত্য নয়। এক্ষেত্রে তাদের মাতৃত্বই প্রধান হয়ে উঠেছে।

পেশাকেন্দ্রিক ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন গবেষক জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ। তাঁর গবেষণার ফলাফল--"*কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাস*"।এই গ্রন্থে গবেষক সামাজিক স্তরভেদে ভাষা বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। মূলত কুমারখালী অঞ্চলকে গবেষক তাঁর গবেষণা ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছেন। গ্রন্থের নামকরণও সেই অনুযায়ী। আলোচ্য গ্রন্থে গবেষক নারী ও পুরুষের ভাষা, শিক্ষিতদের ভাষা, অশিক্ষিতদের ভাষা, হিন্দুদের ভাষা, মুসলমানদের ভাষা প্রভৃতি সামাজিক স্তরভেদে ভাষা বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন। আর এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন পেশাগত ভাষা, সুইপারদের ভাষা, কুলিদের ভাষা নিয়ে। পেশাভেদে ভাষাভেদ বহুল পরিচিত বিষয়। প্রত্যেকটি পেশার ক্ষেত্রে ভাষাভাষীরা নিজেদের অজান্তেই ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে। তিনি বলেছেন–"*একজন শিক্ষিত লোকের যেমন বই, খাতা, কলম ইত্যাদির প্রয়োজন তেমনি একজন কৃষকের প্রয়োজন লাঙ্গল, জমি, বীজ ইত্যাদি। আবার একজন উকিল, ডাক্তার, কিংবা সিনেমার অভিনেতার পেশার জন্যও কিছু বস্তু আছে। বস্তুকে বাদ দিয়ে পেশা কল্পনা করা যায় না। ডাক্তারের পেশায় যা ব্যবহৃত হয়, কৃষকের কাছে তা মূল্যহীন। তেমনি তাঁতীর পেশায় যে জিনিসের প্রয়োজন, কামার কিংবা কুমারের সে রকম জিনিসের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনের নিত্যতা ও প্রয়োজনহীনতা ভাষার জগতকে আলোড়িত করে। ভাষা ছাড়া বস্তুকে চেনা যায় না, জানা যায় না। পৃথক পৃথক পেশায় ব্যবহৃত জিনিস বা বস্তুকে চেনার জন্য ভাষায় পৃথক পৃথক নামে পেশাগত জিনিসগুলো অবস্থান করে থাকে।*" [১২] প্রতিটি পেশায় কিছু কিছু ব্যবহার্য দ্রব্য আছে। আর আছে কিছু কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। যেমন– কৃষকরা লাঙল, কোদাল, নিড়েন, ঝাঁকা প্রভৃতি বস্তু ব্যবহার করে চাষের কাজে। তাদের চাষ আবাদ সংক্রান্ত কিছু কোড ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে। যেমন- '*জো হওয়া*', *জ্যাটো ফসল, নাবি ফসল* প্রভৃতি। আবার রাজমিস্তিরি পেশায় কড়াই, কর্নিক, উশো, পেটা কাঠ প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। রাজমিস্তিরি পেশায় আরও কিছু কিছু কোড ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। যেমন-আমা ইট, আধলা, পোয়া প্রভৃতি। এইভাবে কামার, কুমোর, তাঁতি, ডাক্তারি, শিক্ষকতা, বাসের কণ্ডাকটরি প্রভৃতি পেশাতেও নিজস্ব কিছু শব্দ ও কোড ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। এক পেশার শব্দাবলী অন্য পেশার মানুষরা সাধারণত ব্যবহার করে না। একজন

শিক্ষক এমনিতে 'জ্যাঠো ফসল', 'নাবি ফসল' কথাগুলি ব্যবহার করবেন না, বা একজন কৃষক কখনই 'প্রভিশনাল ক্লাস','অফ পিরিয়ড' কথাগুলি বলবে না। একজন কামার যেসব যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করে, একজন তাঁতি সেইসব যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করে না। ফলত ব্যবহার্য যন্ত্র সংক্রান্ত কথাবার্তায় কামারের সঙ্গে তাঁতির, কৃষকের সঙ্গে শিক্ষকের, ডাক্তারের সঙ্গে উকিলের পার্থক্য হয়ই। এই প্রসঙ্গে গবেষক বলছেন—*"ভাষা ব্যবহারের প্রথম পর্যায় থেকেই পেশাগত ভাষা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পেশাগত কারণে ভাষার ব্যবহারের জন্যই মূলত ভাষায় প্রায়োগিক বৈচিত্র্য এসেছে। পেশাগত কারণে ভাষা ব্যবহারের জন্য ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি ভাষা মানব জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাসের জন্য পেশাগত ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। এক এক পেশাকে এক এক রকম শব্দ, খণ্ডবাক্য কিংবা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এই ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, খণ্ডবাক্য কিংবা বাক্যের অর্থের ভিন্নতার জন্য পেশাগত ভাষার শ্রেণী বা স্তরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।"* [১৩] পেশাভিত্তিক ভাষা বিষয়ে গবেষণা বাংলা ভাষায় নিতান্ত কম হয়নি। উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা তার বিস্তৃত পরিচয় নিয়েছি। তবু অনেক ক্ষেত্র এখনও অকর্ষিত রয়েছে। কৃষিকাজ, সব ধরনের গাড়ির চালক, পরিচালক, রং মিস্তিরি, রাজ মিস্তিরি, কুলি, ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি পেশার ভাষা বিষয়ে বিশেষ কাজ হয়নি। বর্তমান নিবন্ধে আমরা কৃষকদের ভাষা বিষয়ে কিছুটা অন্বেষণের চেষ্টা করব। ইতিপূর্বে গোপেন্দু মুখোপাধ্যায় বর্ধমান জেলার কৃষকদের ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'রাঢ়ভূমির কৃষিকেন্দ্রিক লোকভাষা ও সংস্কৃতি'। আমাদের আলোচনা অগ্রসর হবে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের কৃষকদের ভাষা নিয়ে।

৩

কৃষিকাজ মানুষের বহু প্রাচীন জীবিকা। শিকারমূলক ও আহরণ মূলক জীবিকার সীমা পেরিয়ে আমাদের প্রপিতামহরা সেই কোন্ দূর অতীতে কৃষিকাজ শুরু করেছিলেন। অতঃপর আজও তার ধারা সমান ভাবে বহমান। এখনও পৃথিবীতে বিশেষত আমাদের দেশে কৃষকের সংখ্যাই বেশি। বর্তমান ভারতবর্ষের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজীবী মানুষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। ফলত এ রাজ্যে কৃষিকে কেন্দ্র করে যে আলাদা একটা সংস্কৃতি তৈরি হবে

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক বিশাল সংখ্যক মানুষ যখন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তখন কৃষিভাষা নামক ভাষার একটি আলাদা সংরূপ তৈরি হওয়াটাও আশ্চর্য নয়। দক্ষিণবঙ্গের জেলা গুলিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে আমরা দেখেছি সেই সংরূপ তৈরি হয়েছে। যার মধ্যে মিশে আছে সমাজেতিহাসের এক বিরাট অধ্যায়। সমাজভাষাবিজ্ঞানসহ সমাজেতিহাসের সার্বিক পাঠ নেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষিকেন্দ্রিক ভাষার চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে কৃষি কেন্দ্রিক ভাষার প্রচুর নমুনা সংগ্রহ করেছি আমরা। প্রাপ্ত ভাষিক উপাদানগুলি একাধিক শ্রেণি-উপশ্রেণিতে বিভাজিত করে আলোচনা করা যায়। বর্তমানের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তেমনটা করার বিশেষ সুযোগ নেই। তাই কৃষিকেন্দ্রিক ভাষার কিছু নমুনা এখানে উল্লেখ করব আমরা।

কৃষিকেন্দ্রিক শব্দ—

গোণ্ডা-গণনার একক, পোন-গণনার একক, নাবি চাষ-নির্দিষ্ট সময়ের পরে চাষ, জ্যাটো চাষ--নির্দিষ্ট সময়ের পরে চাষ, বিদেকাটি-জমিতে চাষ দেওয়ার যন্ত্র বিশেষ, জো হওয়া-যে কোনো ফসল চাষ করার জন্য জমির উপযুক্ত অবস্থা, টেক জমি-উঁচু জমি, এই জমিতে জল দাঁড়ায় না, গড়ান জমি-একদিকে ঢালু জমি, গড়ে ও ঝালন-ধান ঝাড়ার যন্ত্র বিশেষ, গোঁজা-পাট কেটে নেওয়ার পর জমিতে আটকে থাকা পাটের গোড়া, নাড়া-ধানগাছ কেটে নেওয়ার পর জমিতে আটকে থাকা গাছের গোড়া, কাঁকচা-সরিসা গাছ থেকে সরিষা ঝেড়ে নেওয়ার পর শুকনো সরিষা গাছ, নিড়েন-জমির ঘাস পরিষ্কার করার যন্ত্র বিশেষ ইত্যাদি। দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতিতে এই রকম কৃষি কেন্দ্রিক শব্দের পরিমাণ প্রচুর। বর্তমানের সংক্ষিপ্ত পরসিরে সব গুলোর উল্লেখ সম্ভব নয়।

কৃষিকেন্দ্রিক বাক্য—

যে এল চষে সে রইল বসে, নাড়া কাটারে ভাত দিতি হবে পাথর ঠেসে!

এগুনতি চুলোর জাতে দিলি হবেখন।

বীজ এখনও রেডি হয়নি।

ওকথায় চিটে পড়ে গেছ্।

ওরাম হজবজ করে বোঝালি হবে না।

ওসব দেশের লোক দু' বিঘে জমিতি লাল হয়ে যাচ্ছে।

কত করে রেট যাচ্ছে।

কত প্রফিট দাঁড়াচ্ছে।

কপাল ঠ্যালা করে রুল্লুম, তা যা করে আল্লা।

কলকাতায় মাল নে যায়।

কাজ ছেড়ে দিলি আজান দিতি না দিতি।

কৃষিকেন্দ্রিক প্রবাদ প্রবচন—

ভাড় গলাতে পারে না, পেয়ের বায়না করেছে।

চালন ধুসনির বিচার করে।

ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে, গোবর বলে তোমারও দিন আসছে।

আমানি ঠেলে পান্তা।

আশায় মরে চাষা।

খাল বিল সব বয়ে যাচ্ছে, ঘোগে কাদা দে কি হবে।

কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে পরে ট্যাশ ট্যাশ।

গম চাষ না, ভুতির খাটান।

গাছ বলে মুই ফলতি জানি, যদি না পড়ে পড়শির পানি।

চাষা মানেই ড্যাম শুয়ার।

৪

কৃষিকাজের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন এবং বর্তমানেও একাজের ঐতিহ্য সমান মাত্রায় বজায় আছে। শুধু তাই নয় এ কাজের সীমা বর্তমানে আরও প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে পৃথিবী, বদলে গিয়েছে মানুষের জীবনযাত্রা। ফলত কৃষকের ব্যক্তিজীবন ও কৃষিক্ষেত্রসহ সমগ্র কৃষি সংস্কৃতিতে পড়েছে পরিবর্তনের অনিবার্য প্রভাব। এইসব পরিবর্তনের ধারা পথে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন সব ভাষা, হারিয়ে গিয়েছে অনেক পুরাতন ভাষিক উপাদান। একটা সময় কৃষিক্ষেত্রে কৃত্রিম জলসেচের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে চাষ আবাদ করা হত। ফলত কৃষিকাজে বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল না। এখন কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা হওয়ার ফলে একই জমিতে নানারকম ফসল ফলান হচ্ছে, বছরের প্রায় সব সময়ই কোনো না কোনো চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে শুধু ফলনেই বৈচিত্র্য আসেনি, কৃষিভিত্তিক ভাষার সীমাও সম্প্রসারিত হয়েছে। সময়ের সাথে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিতেও পরিবর্তন এসেছে। যেমন- জমিতে চাষ দেওয়ার জন্য একটা

সময় কেবলমাত্র গরুতে টানা লাঙল ব্যবহৃত হত। বর্তমানে সেখানে যন্ত্রচালিত লাঙল (পাওয়ার টিলার) ব্যবহৃত হচ্ছে বহুল পরিমাণে। যদিও গরুতে টানা লাঙলের ব্যবহার বর্তমানে একেবারে নেই একথা বলা যায় না। তবে যন্ত্রচালিত লাঙলের আবির্ভাবে গরুতে টানা লাঙলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছে। তখন ধানঝাড়ার জন্য আমাদের প্রপিতামহদের হাতে ঝালন, গড়ে ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু বর্তমানে ধান ঝাড়া মেসিন তৈরি হয়েছে। এই সব নতুন যন্ত্রপাতিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন শব্দ। পুরানো যন্ত্রপাতি'র ব্যবহার কমে যাওয়ায় তৎসংলগ্ন শব্দের ব্যবহার কমে যাচ্ছে। অথচ কৃষিক্ষেত্রের এক বিশাল ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে শব্দগুলি। তাই সেগুলির সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। একটা সময় পর্যন্ত জমির উপর ব্যক্তি মালিকানা প্রযোজ্য ছিল না। তখন গোষ্ঠীর অধীনে সমস্ত জমি গচ্ছিত থাকত। পরে ব্যক্তি মালিকানার প্রচলন হল। এল ভাগাভাগির প্রশ্ন। তিনভাগের একভাগ (তেভাগা), চার ভাগের একভাগ ইত্যাদি কথার প্রচলন তখন থেকেই। বিশ শতকের ছয় সাতের দশক থেকে আমাদের দেশে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভুঁইচাষি ও ভূস্বামীর সম্পর্ক একটা নতুন মাত্রা পেয়েছে। এই নতুন মাত্রাকে ধারণ করার জন্য গড়ে নেওয়া হয়েছে নিত্য নতুন শব্দ।

একটা সময় পর্যন্ত আমাদের দেশের কৃষকরা শুধু খেয়ে পরে বেঁচেবর্তে থাকার তাগিদে কৃষিকাজ করত। তখন সাংসারিক প্রয়োজন অনুসারে ধান, গম, মটর, মুসুরি, আলু, পটল প্রভৃতি চাষ করা হত। বিক্রিবাটার বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ক্রমে ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হল। বাজার অর্থনীতির প্রভাব প্রসারিত হল কৃষক পরিবারের গভীরে। কৃষিক্ষেত্রেও পড়ল তার অনিবার্য প্রভাব। নজর দেওয়া হল নগদ মুনাফার দিকে। যে অঞ্চলে যে ফসল ফলান অধিক লাভজনক তারই চাষ চলতে লাগলো বিশেষ করে। এর ফলে কোনো কোনো অঞ্চলে অপ্রচলিত হয়ে পড়ল বিশেষ কোনো ফসল; সেই সংক্রান্ত শব্দ, ভাষা এবং বিশেষ বিশেষ সংস্কৃতি। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় আঁখ চাষের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। বর্তমানে এই জেলায় আঁখ চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভাষা সংস্কৃতিতে লক্ষ করা গিয়েছে এর প্রভাব। হারিয়ে যেতে বসেছে বহুবিধ বাক্রীতি। যেমন—ঘানগাছ ওঠা, বানতোলা। সময়ের অভিঘাতে যেমন কোনো অঞ্চলে বিশেষ কোনো ফসল

অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে তেমনই নতুন নতুন চাষেরও প্রচলন হয়েছে। ঐ সব চাষবাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে গড়ে নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু নতুন নতুন শব্দ, কথা। কখনো বা পুরনো কোনো শব্দকে নতুন করে প্রাণ দেওয়া হয়েছে। গোণ্ডা, পোন, কাহন, প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার একটা সময় দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজে প্রায় সর্বত্র সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। বর্তমানে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কলাচাষ, পানচাষ প্রচলিত হওয়ায় শব্দগুলি আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পটলের ফুল ঠেকানো, লাউ এর মাচা দেওয়া এসব কথার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না আমাদের প্রপিতামহরা। তাঁরা প্রকৃতির উপর বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। মৌমাছিসহ অনুরূপ কীট পতঙ্গের দ্বারা পরাগ মিলন ঘটে যা কিছু পটল হওয়ার হত। এখন পুংলিঙ্গ ফুল গুলিকে সংগ্রহ করে তা দিয়ে বিশেষ উপায়ে পরাগ মিলন ঘটানো হচ্ছে। বিষয়টিকে বলা হয় *'ফুল ঠেকানো'*। রাসায়নিক সার প্রচলিত হওয়ার আগে জৈব সারের উপর নির্ভর করতে হত কৃষকদের।। জৈব সারকে তাঁরা বলত 'গুবরে সার'। গুবরে সার সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হত *'সারগাদা'*। রাসায়নিক সারের দাপটে জৈব সার এখন অপ্রচলিত প্রায়। ফলে নষ্ট হয়েছে সারগাদার ঐতিহ্য। *'জোনের পান্তা'* কথাটি এই সেদিন পর্যন্ত প্রতিটা সম্পন্ন কৃষক পরিবারে বহুল চর্চিত ছিল। এখন তাতে ভাটার টান শুরু হয়েছে। আগে যারা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করত, বিশেষ অর্থে *'জোন খাটতে'* আসত তাদের পক্ষে পেটভরে একবেলা খেতে পাওয়াটাই ছিল বিরাট ব্যাপার। খাওয়ার কমতি হলে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কৃষকের দুর্নাম হত। কৃষকরা তাই অত্যন্ত সচেতন থাকত এই ব্যাপারে। বাড়ির মেয়েরা আগের দিন রাত্রে যথেষ্ট পরিমাণে ভাত রেঁধে রাখত। সকাল সকাল তা মাঠে পাঠিয়ে দেওয়া হত। এখন জোনেদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এখন তাদের হাঁড়িতেও সকালে খেয়ে বেরোনোর মত ভাত অবশিষ্ট থাকে। তাই কাজের বিনিময়ে খাওয়ার প্রত্যাশা করে না, তারা নগদ টাকা চায়। ওদের কথায় 'জোনের দাম'। জোনের দামের সঙ্গে এখন কৃষি শ্রমিকরা খাওয়া বাবদ নগদ পয়সা দাবি করে। নগদ পয়সা নেওয়ার প্রবণতা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, জোনের পান্তা'র রেওয়াজ তত হ্রাস পাচ্ছে। *'মেন্দার'* কথাটি এখন দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। বছর কুড়ি আগেও কথাটির প্রচলন ছিল। তখন গ্রামের হত দরিদ্র মানুষদের অন্যের জমিতে কাজ করা ছাড়া আর

কিছুই করার ছিল না। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কাজের লোক সবসময় পাওয়া যেত। ফলে খেটে খাওয়া মানুষরা সারাবছর নিয়মিত কাজ পেত না। ওদের কথায় *'জোন বইত'* না। এদিকে জোন না বইলে উনুনে হাড়ি চড়ে না। এই অবস্থায় সারা বছর নিশ্চিন্তে কাজ পাওয়ার লক্ষে কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে কোনো সম্পন্ন কৃষকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হত। চুক্তিবদ্ধ ঐ শ্রমিককেই বলা হত *'মেন্দার'*। বর্তমানে অনেক বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে এখন আর শ্রমিক উদ্বৃত্ত নয়। কাজেই *'মেন্দার'* এর ধারণা এখন আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোনো শ্রমিককে আর মেন্দার হতে হয় না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি সংস্কৃতির এহেন আরও অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। অনেক অনুষঙ্গ কৃষি সংস্কৃতি থেকে অবলুপ্ত হয়েছে। আবার নতুন নতুন বহু অনুষঙ্গ বর্তমানে প্রচলিত হয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা চাষবাসের ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করতই না। এখন কৃষকদের মুখে প্রায়শই ইংরেজি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আদ্যন্ত কৃষক পরিবার বলতে যা বোঝায় এখন তার সংখ্যা খুবই কম। পরিবারের প্রত্যেকে এখন আর কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। কেউ কেউ নিয়মিত কলকাতায় বা নিকটবর্তী শহরে কাজ করতে যায়। এর কমবেশি প্রভাব পড়ে পরিবারের ভাষিক মানচিত্রে। গ্রাম থেকে যেসব মানুষ প্রতিদিন শহরে যাচ্ছে সন্ধ্যায় আবার ফিরে আসছে তারা। মেলামেশা হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে। এতে পারিবারিক ভাষিক মানচিত্রের পাশাপাশি সামাজিক মানচিত্রও বদলে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজের ভাষা সংস্কৃতি নিজস্ব রঙে রঞ্জিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।

তথ্যসূত্র

১. Bright , Willian (Chief ed.), International Encyclopaedia of linguistics, vol-4, oxford uni. press, 1994
২. শ', রামেশ্বর , সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপনী , কলকাতা , ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ.-৬৯৬
৩. হুমায়ুন, রাজীব, সমাজভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ.-১১
৪. উদ্ধৃত; হুমায়ুন, রাজীব, সমাজভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ.-২০

৫. উদ্ধৃত; হুমায়ুন, রাজীব, সমাজভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২০

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পাদনা), বাঙালির ভাষাচিন্তা (সমাজভাষা), সেন, সুকুমার, বর্ধমানের মুচিদের ভাষা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃ: ৯৩

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পাদনা), বাঙালির ভাষাচিন্তা (সমাজভাষা), চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ, খুলনা জেলার মাঝির ভাষা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃ: ১১০

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পাদনা), বাঙালির ভাষাচিন্তা (সমাজভাষা), কুণ্ডু, অশোককুমার, কামারশালের ভাষা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃ: ১১৭

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পাদনা), বাঙালির ভাষাচিন্তা (সমাজভাষা), বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, বারবনিতার ভাষা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃ: ১২১

১০. তদেব, পৃ. ১২১

১১. সাইফুন্না, গবেষণা সন্দর্ভ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নারী- ভাষা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ২০০৬, পি এইচ. ডি ডিগ্রি প্রাপ্ত

১২. জাহিদ, জাহাঙ্গীর আলম, কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাস, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০৪, পৃ: ১১৮

১৩. জাহিদ, জাহাঙ্গীর আলম, কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাস, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০৪, পৃ: ১২৩